হাকিকাত কিতাব প্রকাশনী : ৭

সুন্নি পথ

আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশিক (র.)

হাকিকত কিতাবেভি পাবলিকেশন নং ৭

মুক্তি সরণি

হুসাইন হিলমি ইশিক

মুক্তি সরণি

[তেইশতম সংস্করণ]

মূল : **হুসাইন হিলমি ইশিক**
....
৩৪০৮৩ ফাতিহ-ইস্তাম্বুল, তুর্কি।

অনুবাদ : **রাশেদুল বারী** আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
হাছিছা নাওশীন অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফাহাদ আজাদ IHC বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইউসুফ আলী ... বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক : **..............**

নীরিক্ষণে : **মুহাম্মদ আবদুল করিম**
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ : .... ২০২০ ইংরেজি।

প্রকাশনায় : **হাকিকত কিতাবেভি বাংলাদেশ**
....

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

অনেক বই রয়েছে যেগুলো ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। ইমামে রব্বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত 'মাকতুবাত' শরিফ (তার অন্যান্য খণ্ডসহ) একটি মূল্যবান কিতাব। এরপর সবচে গুরুত্বপূর্ণ হলো একই নামের কিতাব 'মাকতুবাত' যা ইমাম রব্বানীর তৃতীয় শাহজাদা এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য হযরত মাসুম রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। হযরত মুহাম্মদ মাসুম 'মাকতুবাত' শরিফের তৃতীয় খণ্ডের ষোড়শ চিঠিতে লিখেছেন ইমান হলো কালিমায়ে তাইয়্যেবাতে উল্লেখিত উভয় অংশকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, আর তা হলো : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (কালিমায়ে তাইয়্যেবা হলো ইমানের একটি বিশেষ বহিঃপ্রকাশ)। অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মান্য করে তাঁর সকল বিধিবিধানের উপর আস্থা স্থাপনকারীও মুসলিম হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে তাঁর উপর কুরআনুল কারিম নাজিল করেছেন। কুরআনুল কারিম হলো আল্লাহ তা'য়ালার কালাম। এটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিগত মতামত, দর্শন বা ইতিহাসের বিবরণ থেকে তৈরি কোনো সংকলনগ্রন্থ নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন এবং সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাকে বলা হয় হাদিস শরিফ। ইসলাম কুরআনুল কারিম এবং হাদিস শরিফ প্রায়োগিক রূপ। পৃথিবীতে কুরআনুল কারিম এবং হাদিস শরিফের অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। যে কথাটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে আসেনি তা কখনো ইসলামি বইয়ে উদ্ধৃত হতে পারে না। ইমান ও ইসলাম বলতে বুঝায় কুরআনুল কারিম এবং হাদিস শরিফ বিশ্বাস করা। যেব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষাকে অস্বীকার করলো, সে মূলত মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণীকেই অস্বীকার করলো। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের তাই জানাতেন যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে নির্দেশ দিতেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের সময়ে সে সমস্ত বিধানগুলো তাদের শিষ্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তারা তাদের সময়ে সেগুলো কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। যে সকল আলেম সে সমস্ত কিতাব রচনা করেছেন তাদেরকে আহলে সুন্নাহর পণ্ডিত বলা হয়। সে আহলে সুন্নাতের কিতাবগুলো বিশ্বাস করা মানে আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম মান্য করা। আর যে সকল লোক এ বিশ্বাসগুলো ধারণ করে তারা হলো মুসলিম। আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা আহলে সুন্নাতের পণ্ডিত দ্বারা রচিত কিতাবসমূহ থেকে আমাদের বিশ্বাস (ইসলাম) সম্পর্কে জানতে পারছি, অসৎ সংস্কারক বা বেদাতি কর্তৃক লিখিত প্রতারণাপূর্ণ বই থেকে নয়।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা ও ফেসাদ ছড়িয়ে পড়বে তখন কেউ যদি আমার সুন্নাত অনুসরণ করে, তাহলে সে শতজন শহিদের সমপরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী হবে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেছে।"

একমাত্র আহলে সুন্নাত মতাদর্শী পণ্ডিতদের কর্তৃক লিখিত কিতাব অনুযায়ীই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুসরণ করা সম্ভব। মুসলমানদের চার মাযহাবের প্রত্যেক ইমামকে আহলে সুন্নাতের পণ্ডিত বলা হয়। ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন আহলে সুন্নাত পণ্ডিতদের অগ্রদূত। ইসলাম বিরোধী প্রচারণা যা বৃটিশরা বহু শতাব্দী ধরে করে যাচ্ছে; তাদের উদ্দেশ্য হলো একজন মুসলিমকে হলেও বিপথগামী করে খ্রিষ্টান বানানো। তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা নতুন একটি পদ্ধতি বের করেছে আর তা হলো অসংখ্য পতিতালয় নির্মাণ করা। যৌনকর্মীরা ইসলাম বিশ্বাস করে না। এসকল ধর্মবিদ্বেষী লোক আহলে সুন্নাত উলামা কর্তৃক বর্ণিত জ্ঞানকে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও সকল ঐশী আহকামকে অস্বীকার করে। অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসকেও তারা মানতে চায় না যেমন–মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, জান্নাত এবং জাহান্নাম ইত্যাদি।

সূচি

ভূমিকা

আল্লাহর নামে বইটি শুরু করছি!
আল্লাহ নামেই বিরাজমান সর্বোচ সুরক্ষা!
তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অগুনতি-অসীম;
সমগ্র করুণা তাঁরই, ক্ষমাতেই তাঁর পরিতোষ!

আল্লাহ তা'য়ালা এ ভুবনের সমস্ত মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, তাই প্রয়োজনীয় উপাদান সৃষ্টি করে আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন। সেসব মুসলিম/বিশ্বাসী যারা স্বীয় পাপের দরুন জাহান্নামের বাসিন্দা হয়েছিল দণ্ডিত শাস্তি প্রাপ্তির পর অপরাধ মার্জনা করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সমগ্র প্রাণীকুলের তিনি একক গ্রস্টা, প্রতিক্ষণে তিনি জীবে প্রাণ সচল রাখেন এবং যাবতীয় শঙ্কা ও সংকট থেকে পরিত্রাণ দান করেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র নামের প্রতি বিশ্বাসী হচ্ছে আমি বইটি লেখা শুরু করছি।

হামদ[১] একমাত্র মহান রব আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। দরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সম্মানিত পরিববারবর্গ ও তাঁর একান্ত অনুগত ও একনি সাহাবিগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমের প্রতি।

বলা হয়ে থাকে বর্তমান বিশ্ব সংগ্রামের বিশ্ব; যা শুধু একটি গতানুগতিক মন্তব্য নয়। এমন একটি শ্রমশীল পন্থায় আমাদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে, যা সবদিক থেকে নানা সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমরা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা যেমন–গ্রীষ্মকালের মাত্রাতিরিক্ত গরম আর শীতকালের হাড়কাঁপা শীতের বিপরীতে সংগ্রাম করি, বিধর্মী ও বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তিদের নানা ঠাট্টা ও অপবাদের মোকাবিলাও আমাদের করতে হয়, যারা তাদের যাবতীয় মনস্তাত্ত্বিক রণ ও বস্তুগত অস্ত্র দিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের হামলা করছে। শক্রর হামলা প্রতিরোধে সর্বাগ্রে জরুরি শক্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। অন্যথায় নিজেদের রক্ষা করতে নেয়া গৃহীত পদক্ষেপ আমাদের প্রতিবেশি ও বন্ধুদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। একটি স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের জন্য দুটো জিনিস প্রয়োজন মাল (সম্পদ) এবং মুলক (অধিকৃত)। সুঁইসুতা থেকে শুরু করে ঘর কিংবা এর্পাঁমেন্ট সবকিছুই সম্পদের আওতাভুক্ত।

আল্লাহ তা'য়ালা কিছু মানুষ ও সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। মানুষের এ সম্পদ এবং তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন তার জন্য নেয়ামত, যা থেকে সে উপকৃত হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পদ এবং বিত্তের ততটুকুই ব্যবহার করে, যতটুকু আল্লাহ তা'য়ালা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এটা কখনোই গ্রহণীয় নয় যতটুকু অনুমতি আছে তার বেশি ব্যবহার করা কিংবা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ব্যবহার করা। ব্যাপকভাবে একটি কথা প্রচলিত আছে যে -তুমি সম্পদের জন্য কখনও অহংকার করো না এবং কখনই নিজেকে অতুলনীয় মনে করো না। একটি বিরূপ বাতাস বইতে পারে এবং ছাটাই করা শস্যের মত তোমার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারে। সম্পদ-সম্পত্তি হারাম উপায়ে (অন্যায়ভাবে) অর্জন করলে তাকে দুনিয়া (ইহজগত) বলা হয়। হারাম ও মাকরূহের সমষ্টিই হচ্ছে দুনিয়া এবং তা ক্ষতিকর। কোনো কিছু উপকারী নাকি ক্ষতিকারক এ ব্যাপারে বিভিন্ন বইয়ের নানা মত রয়েছে। এসবের মাঝে সবচে সঠিক পার্থক্যটা নিরূপণ করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা।

আল্লাহ তা'য়ালার আদেশকে ফরজ আর নিষেধকে হারাম বলা হয়। রসুল (দ.) এর আদেশকে সুন্নাত এবং নিষেধকে মাকরূহ বলা হয়। আর এ চারটি বিষয়ের সামষ্টিক রূপই ইসলাম। হৃদয়ে ইমানের অস্তিত্বের লক্ষণ হল আহকামে ইসলামিয়াকে (ইসলামের আদেশ ও নিষেধ) পছন্দ করা এবং গ্রহণ করা। একটি মাত্র সুন্নাত অস্বীকারের ফলে অস্বীকারকারী তার ইমান হারিয়ে কাফির (অবিশ্বাসী) হচ্ছে যায়। যেব্যক্তি ইমানদার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি বিধি (যেমন একটি আদেশ বা নিষেধ) অমান্য করে, সে ফাসিক (মুসলিম) হচ্ছে যায়। ইসলামকে অমান্য করা পাপ। একজন কাফিরকে জাহান্নামে চিরকালের জন্য পোড়ানো হবে, তবে একজন ফাসেক (মুসলিম) যতক্ষণ তার পাপ (গুনাহের কারণে) পরিমাণ শাস্তি প্রাপ্ত হবে না, তাকে ততক্ষণ পোড়ানো হবে এবং এরপর তাদের জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। যেব্যক্তি

---

[১]. প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

একইসাথে ইমান আনয়ন করে এবং ইসলামকে অনুসরণ করে, তাকে সালিহ বান্দা (কুল) বলা হয়। (সালিহ–এর স্ত্রীবাচক শব্দ হল সালিহা)। আর যেব্যক্তি পর্বত বা বিজনভূমিতে বসবাসের কারণে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞাত, সে কাফির বা ফাসেক (মুসলিম) হিসেবে পরিগণিত হবে না। কেয়ামতের দিন হিসাব নিকাশের পর এ জাতীয় লোকদের জান্নাত বা জাহান্নামের অধিবাসী করা হবে না। পশুর মতো তাদেরও বিলুপ্ত করা হবে। পবিত্র ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম, ইসলাম হচ্ছে এক মহান নেয়ামত, যা অবারিত সুখের কারণ হয়। যে লোকেরা এ মহা নেয়ামতকে মূল্যায়ণ করতে পারেনি, তাদেরকে এ কর্মের জন্য মাশুল দিতে হবে।

প্রত্যেক মুসলমানকে প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। এ সালাতই আদায়কারীদের হৃদয়ে ইমানের লক্ষণ তৈরি করে। এ সালাত অস্বীকারের ফলে অস্বীকারকরীগণ কাফির (অবিশ্বাসী) হচ্ছে যায়। স্বর্গীয় (তবে অপ্রচলিত) ধর্মে বিশ্বাসী এমন কাফিরকে আহলে কিতাব বা কিতাবের লোক/অনুসারী বলা হয়। আর যেব্যক্তি এ (অপ্রচলিত) ধর্মগুলোও অস্বীকার করে অর্থাৎ, আহলে কিতাবেরও অন্তর্ভুক্ত নয়, তাকে মুশরিক (Polytheist) বলা হয়। এ অবিশ্বাসীদের থেকে কিছু ইহুদি এবং অধিকাংশ খ্রিষ্টান মুশরিক হিসেবেই গণ্য। বর্তমান বিশ্বে আহলে কিতাব তথা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী নেই বললেই চলে। কারণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা স্বীয় ধর্মে বিকৃতি ঘটিয়ে মূল ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। ফলে আহলে কিতাবের সবাই মুশরিক হিসেবে গণ্য বর্তমান সময়ে। একজন মুসলিম যে হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর কোনো বাণী না বুঝার কারণে তা ভুলভাবে উদ্ধৃত করেছে, তবে সে বিদ‘আত করেছে। শিয়াবাদী এবং ওহাবি মুসলমানরা এ বিদ‘আতের ধারক। মুহাম্মদ (দ.)’র একটি মাত্র বাণী যদি কেউ অস্বীকার করে, সে কাফির/অবিশ্বাসী বলেই গণ্য হবে। সেই প্রকৃত মুসলিম যে হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র সকল বাণীই কোনো পরিবর্তন করা ছাড়াই বিশ্বাস করে নিবে এবং তারাই আহলে সুন্নাত। ইমাম আজম আবু হানিফা, নুমান বিন সাবিত হচ্ছেন এসব প্রকৃত ইসলামিক স্কলার এবং প্রকৃত মুসলিমদের প্রধান। আহলে সুন্নাত তথা প্রকৃত মুসলমান, যারা সত্যিকার ইসলামের ধারক তারা ইসলামি আইনানুসরণ এবং ইবাদত পালনের ভিত্তিতে চার মাযহাবে বিভক্ত-হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি এবং হাম্বলি। চার মাযহাবের অনুসারীগণ একে অপরকে ভাই হিসেবেই গণ্য করে। তারা একে অপরের পিছনে এক্তেদা করে সালাত আদায় করে। (অন্য কথায়, ইমাম উল্লেখিত চার মাযহাবের যেকোনোটির অনুসারীই হোক না কেন তার পিছনে জামাতের সাথে সালাত আদায় করে অন্য মাযহাবের অনুসারীগণ। বিরুদ্ধবাদী বিদ‘আতপন্থী লোকদের কারণে এ প্রকৃত মুসলিমদের ভুল জ্ঞান করা উচিত নয়। বিদ‘আতি লোকজন ইসলামের অভ্যন্তরে থেকে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আলহামদুলিল্লাহ! পুরো বিশ্বের অধিকাংশ প্রকৃত মুসলিম আহলে সুন্নাত মতবাদে বিশ্বাসী। ওয়াহাবি ও শিয়া, যারা দুটি পৃথক মতবিরোধপূর্ণ পথ অনুসরণ করে, তাদের সংখ্যা দিনাদিন হ্রাস পাছে)। যারা নিজেদের মুসলিম মনে করে তাদের মধ্যে মূলত তিনটি ভাগ রয়েছে-

প্রথম দল হলো–সেসব প্রকৃত মুসলিম যারা পদে পদে সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ করে থাকেন। তাদেরকে আহলে সুন্নাত বা প্রকৃত মুসলিম এবং ফিরকায়ে নাজিয়াহ অর্থাৎ, জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলা হয়।

দ্বিতীয় দল–যারা সাহাবায়ে কেরামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তাদেরকে রাফেজি বা শিয়া এবং ফিরকায়ে দালালাহ (পথভ্রষ্ট দল) বলা হয়।

তৃতীয় দল হলো–যারা সুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। যাদেরকে ওহাবি কিংবা নজদি বলা হয়, তাদের জন্মস্থান আরবের নজদ এর নামানুসারে তাদের নজদি ডাকা হয়। তাদেরকে ফিরকায়ে মালউনা (অভিশপ্ত দল)ও বলা হয়ে থাকে। Ethics of Islam এবং Endless Bliss গ্রন্থের ষ খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে লেখা রয়েছে যে মুসলমানদের মুশরিক বলে ডাকার কারণে তাদের এ নামে অভিহিত করা হয়। বিনা দোষে যেব্যক্তি একজন মুসলিমকে কাফির (অবিশ্বাসী) অপবাদ দেয়, তাকে আমাদের প্রিয় নবী অভিসম্পাত দিয়েছেন। মুসলিমদের মাঝে এমন ত্রিমুখী মতানৈক্য মূলত বৃটিশ এবং ইহুদি ষড়যন্ত্রকারীরা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

সঠিকভাবে ইসলামি মতবাদ ও বিধি নিষেধ শিক্ষাদানকারী হাজার হাজার মূল্যবান বই রচিত হচ্ছে এবং অধিকাংশ বই বিশ্বের অনেক দেশেই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও পুনপ্রকাশিত হচ্ছে। এসব বিশুদ্ধ বইয়ের লেখকরাই হলেন আহলে সুন্নাত এর স্কলার। ইসলামকে পুনর্গঠন ও মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করার নিমিত্তে কিছু লোভী প্রতারক নিজেদের অর্থকড়ি উপার্জন এবং ক্ষমতার লোভে বৃটিশদের পক্ষপাতী হচ্ছে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও দীপ্তিমান প্রথার সমালোচনা করতো, সংহতির শিক্ষা দেওয়া শান্তিবাদী আহলে সুন্নাতের স্কলারদের ব্যঙ্গ করার এবং কুৎসা রটনা করার চেষ্টা করতো, সেইসাথে ইসলামকে অন্যরূপে উপস্থাপন এ মুসলিমদের বিপথগামী করারও চেষ্টা করতো। মুসলিম ও বিধর্মীদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব শতাব্দী অবধি চলে আসছে এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত চলবে। এ এক অনন্তকালব্যাপী সংঘাত!

আহলে সুন্নাতের স্কলারগণ সাহাবায়ে কেরামদের থেকে সমস্ত জ্ঞানার্জন করেছিলেন। ইসলাম প্রচারের প্রত্যয়ে সাহাবায়ে কেরাম নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে দূর-দূরান্তের দেশে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। যার ফলে বই লেখার মত যথেষ্ট সময় ছিল না তাঁদের। ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দের পরে বেশ কিছু স্কলার তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, সে সময়কার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিকদের মতাদর্শে প্রভাবান্বিত হচ্ছে একটি কলুষিত ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিল। ফলে বাহাত্তরটি নীতিভ্রষ্ট বিদ'আতি দলের সূচনা হয়। এসব বিদ'আতি দলের উত্থানে ইহুদি ও বৃটিশ রাজদ্রোহীদের বিশাল ভূমিকাও রয়েছে।

যেসব মানুষ নিজের নফসের অনুসারী এবং দূষিত মনের অধিকারী, তারা যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। প্রত্যেক বিশ্বাসী স্বীয় নফসের পরিশুদ্ধি তথা নফসের অন্তর্নিহিত অস্বীকৃতি ও পাপাচারের গ্লানি থেকে শুদ্ধ করার জন্য পড়ে থাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং তাদের সহজাত কুপ্রবৃত্তি ও নফসের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে, নফস সংগঠিত অপরাধ, শয়তানের প্রবঞ্চনা, খারাপ সঙ্গ ও বিদ্ধেষপূর্ণ বইয়ের প্রভাব থেকে বাঁচতে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে থাকে। যদি একজন মুসলিম পরিপূর্ণ ইসলামি অনুশাসন মেনে আল্লাহর কাছে চায়, তবে অবশ্যই আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করবেন। অন্যথা একজন মানুষ যদি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত নিয়মিত আদায় না করে, বেগানা বেপর্দা মহিলা কিংবা এমন ব্যক্তি যার সতর উন্মুক্ত তার দিকে অযথা তাকায় এবং এমন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে যা হারাম পন্থায় অর্জিত, তবে সে আহকামে ইসলামির পূর্ণাঙ্গ অনুসারী নয়। তার প্রার্থনা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

মুসলিমদের প্রধান দুটি স্তর আছে : খাস (আলেম সম্প্রদায়) এবং আম (সাধারণ মুসলমান)। এ তথ্যটি রয়েছে Durr-i-Yekta নামক তুর্কি বইয়ে (ইমামজাদা মুহাম্মদ বিন আব্দুল আসাদ (রহ.), কেনিয়া, মৃ.১২৬৭ [১৮৫১ খ্রি.] কর্তৃক রচিত) : আওয়াম হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যারা সরফ এবং নাহু (আরবি ব্যাকরণ ও বাক্যবিন্যাস, সাহিত্য রচনার পদ্ধতি ও নিয়মকানুন) শিখেননি। এসকল ব্যক্তি ফিকহ ও ফতোয়ার বই পড়তে ও বুঝতে পারেন না। তাই এসব লোকদের উপর ফরজ ইসলামি বিশ্বাস ও ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আহলে সুন্নাহর স্কলারদের থেকে তা শেখা। আর স্কলারদের উপরও ফরজ মৌখিক, লেখনী ও প্রচারের মাধ্যমে প্রথমত বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পরবর্তীতে মৌলিক পাঁচটি ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দান করা। জাহিরা (তধযল্ফৎধ) এবং তাতারহানিয়া (Tâtârhâniyya) বইদ্বয়ে উল্লেখ আছে, "অন্যান্য কার্যক্রমের চেয়ে বিশ্বাস (ইমান) সংক্রান্ত বিষয় এবং আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ শিক্ষাদানকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন মহান ইসলামি পণ্ডিত এবং জাহির (প্রকাশ্য) এবং বাতেন (গোপন) জ্ঞান বিশেষজ্ঞ, সাইয়্যিদ 'আবদ-উল-হাকিম আরওয়াশী রহমতুল্লাহি তা'লা আলাইহি' ইন্তেকালের পূর্বে নিম্নোক্ত অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন, প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি ইস্তাম্বুলের মসজিদে কেবল বিশ্বাস (ইমান) এবং আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ ও ইসলামের শিক্ষা দেওয়া নৈতিকতা প্রচার করার চেষ্টা করেছি। সে জন্য আমরা আমাদের সকল বইয়ে আহলে সুন্নাত এর মতাদর্শ, ইসলামের উঁচু নৈতিক মূল্যবোধ এবং অন্যের কাছে ভাল হওয়ার গুরুত্ব নিয়ে কাজ করে যাছি এবং দেশের সেবা ও সহায়তা করছি। ধর্মীয় অজ্ঞ এবং লা-মাযহাবী ব্যক্তি (এবং জিন্দিক) কর্তৃক লিখিত বিধ্বংসী নিবন্ধগুলো এবং যা জনগণকে রাজ্যের বিরুদ্ধে উস্কে দেয় এবং ভাইদের মধ্যে মতবিরোধ ছড়িয়ে য়ে এমন আর্টিকেল আমরা গ্রহণ করি না। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ধর্ম তলোয়ারের ছায়াই রয়েছে।" এ বিষয়কে ইঙ্গিত করে যে, রাষ্ট্র ও তার আইনগুলোর সুরক্ষার অধীনে রয়েছে মুসলমানরা শান্তিতে বাস করার নিশ্চয়তা। রাষ্ট্র যত বেশি শক্তিশালী হয়, শান্তি এবং স্বস্তি ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তেমনিভাবে, যে মুসলমানরা শান্তিতে বাস করে এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকান অমুসলিম দেশগুলোতে নির্দ্বিধায় তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারে, তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত নয়। কেননা এরা তাদের স্বাধীনতা দেয়; তাদের আইন লঙ্ঘন করা উচিত নয় এবং তাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তা না হলে তারা অতিরিক্ত অশান্তি বা অরাজকতায় লিপ্ত হতে পারে। আহলে সুন্নাতের স্কলারগণ আমাদেরকে এরূপ হওয়ার উপদেশ দেন। চারটি বিশুদ্ধ মাযহাবের প্রত্যেক স্কলারই মূলত আহলে সুন্নাতের স্কলার হিসেবে পরিগণিত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য : বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দৃশ্য রয়েছে। এগুলো দেখে আপনি কখনও ক্লান্ত হবেন না। এ সৌন্দর্যের নিদর্শনগুলো কি নিজেরাই বাস্তবে রূপ নিয়েছিল? সুতরাং নিখুঁতভাবে সজ্জিত ও সুসমন্বিত প্রত্যেক সৃষ্টি দেখেই মনে হয় যেন সবকিছু একই যন্ত্রেরই উদ্ভাবিত বিষয়। সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, এবং জ্যোতির্বিদ্যার থিউরির উপরে। সর্বোপরি, উপরোক্ত সবকিছুর সমন্বয় ও সামঞ্জস্যতা ঘটেছে মানব সৃষ্টির মাঝে! আমাদের দেহের ভিতরকার প্রতিটা অঙ্গ এমনভাবে সজ্জিত যেন একটি নিখুঁত মেশিনের উপাদান অংশ; যা অনুসন্ধিৎসুদের হতভম্ব করে। এমনকি ডারউইন, একজন অমুসলিম ইংরেজ গুণীজন, যিনি চোখের গঠনপ্রক্রিয়া স্বীকার করে নিয়ে প্রশংসামুখর

হতে বাধ্য হয়েছিল।[২] দুষ্পরিবর্তনীয় এবং আন্তঃনির্ভরশীল আইনের মাধ্যমে সমস্ত প্রাণী একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মীয় বিশ্বাসী লোকেরা বলে যে একজন সর্বজ্ঞ খালিক (স্রষ্টা) আছেন, যিনি এ সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে, সর্বধর্ম অস্বীকারকারী নাস্তিকরা দাবি করে যে সমস্ত কিছু নিজে নিজেই বিক্ষিপ্তভাবে তৈরি হয়েছিল। এ ব্যাপারে স্রষ্টা তাঁর নবীর মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন, ইরশাদ হচ্ছে : আমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি। আমি একা, তোমাদের সকলের মালিক তথা অধিকারী। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, তবে আমি আপনাকে বেহেশতে স্থান দিব। আমি আপনাকে অগনিত সুখ দান করব। আপনি অনন্ত আনন্দ ও অবারিত সুখের জীবনযাপন করবেন। আর যারা আমার নবীকে অস্বীকার করে, আমি তাদের চিরকাল জাহান্নামে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেব। ধারণা করুন, বেহেশত ও জাহান্নামের কোনো অস্তিত্ব ছিল না এবং মুমিনদের নবীদের প্রতি ইমান আনাটা ভুল ছিল, তাদের ভুল তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। তবু যেহেতু নবীগণ সত্য বলেছেন, যে সমস্ত লোক তাদের বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে এবং যারা তাদের অঙ্গীকার পরিবর্তন করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

এটি কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ্য করা গেছে যে প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশেই ধর্মীয় কর্তৃত্ববান ব্যক্তিরা আহলে সুন্না'র এ সঠিক পথটি প্রচার ও রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবুও, কিছু অজ্ঞ মানুষ, যারা আহলে সুন্নাহর স্কলারদের লিখিত বইগুলো পড়তে ও বুঝতে সক্ষম নয়, তারা কিছু মৌখিক এবং লিখিত জ্ঞানশূন্য বক্তব্য তৈরি করে নিজেদের অজ্ঞতা, হীনমন্যতা চাপিয়ে দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের দৃঢ় ইমান বিনষ্ট এবং ভ্রাতৃত্বে ফাটল সৃষ্টি করার অপতৎপরতা চালিয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ক্ষতিকারক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ইলমে হাল এর বইগুলোতে আক্রমণ করে এবং আহলে সুন্নাহর স্কলারদের এবং তাসাউফের মহান সাধকদের নিন্দা করার চেষ্টা করে। আহলে সুন্নার অন্যান্য সকল আলেমদের মতো আহমদ শেভদেট পাশা এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক বোর্ড কুরআনুল কারিমের সঠিক মর্মার্থ যা রসুলে আকরাম (দ.) অনুধাবন করেছিলেন, সেসবের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে তাদের প্রয়োজনীয় উত্তরগুলো দিয়েছিলেন। আমাদের বর্তমান প্রচলিত বইয়ে আমরা সত্য মতবাদ ও বিচ্ছিন্ন মতবাদের পার্থক্য নির্ণয় করি। আমরা আল্লাহর নিকট সনির্বন্ধ মিনতি করি যেন যৌক্তিক ধারণা এবং সুস্পষ্ট বিবেক নিয়ে এ বইটি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করে আমাদের মূল্যবান পাঠকরা এটিকে সুবিচার করেন এবং আহলে সুন্নাহর সঠিক ও সত্য পথে একত্রিত হন এবং মিথ্যাবাদী, নিন্দুক ও মতবিরোধী ব্যক্তিদের এড়িয়ে যান। এটি করার ফলে পাঠকরা চিরন্তন ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবেন।

আমাদের বইয়ের কিছু অংশের পরে যুক্ত করা ব্যাখ্যাগুলো বন্ধনীতে [...] লেখা হচ্ছে। এ সমস্ত ব্যাখ্যাও মূল বই থেকে গৃহীত।

২০০১ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৮০ সৌর হিজরি, ১৪২২ চন্দ্র হিজরি।

---

[২]. "বিভিন্ন দূরত্বের জন্য ফোকাস ঠিক করার, আলোর বিভিন্ন পরিমাণ গ্রহণ করার, গোলকীয় এবং বর্ণালীসংক্রান্ত অপেরণ সংশোধন করার জন্য এর সমস্ত অননুকরণীয় কৌশলগুলি সমেত চোখটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকবে- এটি কল্পনা করা বা ধারণা করা, আমার মতে, নিতান্তই হাস্যকর।" Origin of Species G Pvj©m WviDBb Gi Dw³, J.M, Dent@Sons Ltd, লন্ডন, ১৯৭১, পৃঃ ১৬৭। (The Advised Quote Book এর ১৮ পৃ)।

প্রকাশকের কথা

যে কেউ এ বইটিকে মূল আকারে মুদ্রণ করতে বা অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করতে চান, তজ্জন্যে আমাদের অনুমোদন রয়েছে; এবং যাঁরা এ উপকারী কীর্তিটি সম্পাদন করবে আমরা তাদের নাম আল্লাহু তা'য়ালার কাছে অর্পণ করব এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা জানাছি ও তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যাহোক অনুমতিটি এ শর্তে প্রদিষ্ট যে, মুদ্রণে ব্যবহৃত কাগজ ভাল মানের হতে হবে এবং পাঠ্যটির নকশা এবং বিন্যাস সঠিকভাবে এবং সুন্দরভাবে ভুলত্রুটি ছাড়া করতে হবে।
একটি সতর্কবার্তা : মিশনারিরা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য প্রয়াস চালাছে, ইহুদিরা ইহুদি রাব্বীদের বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে, ইস্তাম্বুলের হাকিকাত কিতাবেবী (বইয়ের দোকান) ইসলাম প্রচারের জন্য লড়াই করছে এবং ফ্রিম্যাসনরা ধর্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এইগুলোর মধ্যে সঠিকটি বুঝবেন ও স্বীকার করবেন এবং সমস্ত মানবতা রক্ষার জন্য তাদের প্রয়াসে সহায়তা করবেন। মানবতার সেবায় এরূপ করার চেয়ে ভালো উপায় বা মূল্যবান কিছু নেই।

কালিমায়ে তানজিহ :

সুবহানল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আলিয়ুল আজিম।যে সকল লোকেরা সকাল সন্ধ্যায় একশবার করে এ কালিমায়ে তানজিহ পাঠ করবে, তাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। এ দোয়াটি 'মাকতুবাত' শিরোনামের মূলবই এবং তুর্কি সংস্করণের (প্রথম খণ্ড) ৩০৭ এবং ৩০৮ নং চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে। এটি সমস্ত প্রকারের উদ্বেগ এবং দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটাবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

এই পুস্তিকাটি আহমদ শেভদেট পাশা রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহর কর্তৃক রচিত, যিনি তার মাজ্জাল্লা' নামক মূল্যবান গ্রন্থে কুরআনের বিধানাবলি একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায় উল্লেখ করে ইসলামের মহান খেদমত করেছেন। এছাড়াও তিনি বারো খণ্ড বিশিষ্ট The Ottoman History লিখেছিলেন, যা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই এবং বিখ্যাত ছরংধং-র অহনরুধ (নবীদের ইতিহাস) গ্রন্থ লিখেছিলেন। তিনি ১২৩৮ সালে (১৮২৩ খ্রি.) লোফজায় (পোল্যান্ডের লুইক্জে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তিনি ১৩১২ সালে (১৮৯৪ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন এবং ইস্তাম্বুলের ফাতিহ মসজিদের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

শেভদেট পাশা বলেন, এ পৃথিবী, অর্থাৎ সবকিছুই অস্তিত্বহীন ছিল। আল্লাহ তা'য়ালা শূন্য থেকে অস্তিত্বের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর শেষ অবধি মানবজাতির মাধ্যমে এ পৃথিবীকে সজ্জিত করেছেন। মাটি থেকে হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সন্তান-সন্ততি দ্বারা পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করেছেন। মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে পথপ্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে তাদের কতিপয়কে নবী (আ.) হিসেবে মনোনীত করে সম্মানিত করেছেন। নবীদের (আ.) উচ্চ মর্যাদা প্রদান করে সাধারণ লোকদের থেকে আলাদা করেছেন। তিনি হযরত জিব্রাঈল (আ.) (জিব্রাল, গ্যাব্রিয়েল) এর মাধ্যমে নবীদের কাছে তাঁর আদেশগুলো পৌঁছে দিতেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক নবীগণের (আ.) নিকট আনীত আল্লাহর বাণীসমূহ তাঁদের উম্মতদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.)। এ দুজনের মধ্যবর্তী সময়ে অনেক নবী-রসুল এসেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালাই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন। কতিপয় পরিচিত নবীরসুলে নাম :

হযরত আদম, হযরত শিস, হযরত ইদ্রিস, হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসমাইল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত আইয়ুব, হযরত লূত, হযরত শুয়াইব, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত ইউনুস, হযরত ইলিয়াস, হযরত জুলফিকার, হযরত যাকারিয়া, হযরত ইয়াহিয়া, হযরত আল-ইয়াসা, হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম। হযরত শিস (আ.) ব্যতীত এ নবীদের মধ্যে পঁচিশজনের নাম কুরআনুল -কারিমে রয়েছে। কুরআনুল কারিমে উযাইর, লোকমান ও যুল কারনাইনের নামও উল্লেখ রয়েছে। আহলে সুন্নাহর কতিপয় বিজ্ঞজনের মতে, উপরের তিনজন (উযাইর, লোকমান ও যুলকারনাইন) এবং তুব্বা ও খিজির (আ.) নবী ছিলেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন, তারা আউলিয়া ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) হলেন হাবিবুল্লাহ (আল্লাহর প্রিয়তম)। হযরত ইব্রাহিম (আ.) হলেন খলিলুল্লাহ (আল্লাহর প্রিয়/বন্ধু)। হযরত মুসা (আ.) হলেন কালিমুল্লাহ (যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন)। হযরত ঈসা (আ.) রুহুল্লাহ (আল্লাহ যাকে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলেন)। হযরত আদম (আ.) সাফিয়ুল্লাহ (যার ভুল আল্লাহ ক্ষমা করেছিলেন)। হযরত নূহ (আ.) হলেন নাযিয়ুল্লাহ (যাকে আল্লাহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন)। এ ছয়জন নবী-রাসুল অন্য নবী-রাসুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁদেরকে উলুল-আযম বলা হয়। সর্বোপরি সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (দ.)।

মহান আল্লাহু তা'য়ালা পৃথিবীতে একশত সহিফা (পুস্তিকা) এবং চারটি আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছিলেন। সবগুলো সহিফা ও আসমানি কিতাব হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী-রসুলগণের নিকট নিয়ে এসেছিলেন। তন্মধ্যে দশখানা সহিফা হযরত আদম (আ.) এর প্রতি, পঞ্চাশ খানা হযরত শিস (আ.)এর প্রতি, ত্রিশ খানা হযরত ইদ্রিস (আ.) এর প্রতি এবং দশ খানা হযরত ইবরাহীম (আ.)এর প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। [সাহিফা, (এই প্রসঙ্গে) এর অর্থ একটি ছোট বই, একটি পুস্তিকা। এখানে পুস্তিকার মর্মার্থ কাগজের শীটের গুছ নয়, যা আমরা জানি]। চারটি আসমানী গ্রন্থের মধ্যে তাওরাত শরিফ [তোরাহ] হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি, যাবুর শরিফ হযরত দাঊদ (আ.) এর প্রতি, ইনজিল শরিফ [ল্যাটিন ইভানজেলিয়াম] হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রে আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআনুল কারিম আমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রে নবী ও রসুল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিল।

হযরত নূহ (আ.) এর সময়কার বন্যায় সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত হয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং প্রাণী ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো; কিন্তু তাঁর সাথে নৌকায় থাকা মুমিনগণ এর থেকে নিস্তার পেয়েছিল। হযরত নূহ (আ.) জাহাজে উঠার সময়, প্রত্যেক প্রকার প্রাণীর এক জোড়া করে সঙ্গে নিয়েছিলেন, যা থেকে আজকের প্রাণীগুলোর বহুগুণে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে।

হযরত নূহ (আ.) এর জাহাজে তাঁর তিন পুত্র ছিলেন : সাম (শেম), ইয়াফাস (জাপেথ) এবং হাম (হাম)। বর্তমানে পৃথিবীর মানবজাতি তাদেরই বংশধর। এ কারণে তাঁকে দ্বিতীয় পিতা বলা হয়।
হযরত ইব্রাহিম (আ.) ছিলেন হযরত ইসমাইল এবং হযরত ইসহাক (আ.) এর পিতা। হযরত ইসহাক (আ.) ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ.) এর পিতা। হযরত ইয়াকুব (আ.) ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.) এর পিতা। হযরত ইয়াকুব (আ.) কে হযরত ইসরাঈল বলা হতো। এ কারণেই তাঁর পুত্র ও নাতিদের বনী ইসরাঈল (ইসরাঈলের সন্তান) বলা হয়ে থাকে। বনী ইসরাঈলের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেল এবং তাদের মধ্যে অনেক নবীর আগমন হয়েছিল। হযরত মূসা, হারুন, দাউদ, সোলাইমান, জাকারিয়া, ইয়াহিয়া এবং ঈসা (আ.) তাদের মধ্যে অন্যতম। সুলাইমান (আ.) ছিলেন দাউদ (আ.) এর পুত্র। হযরত ইয়াহিয়া (আ.), হযরত যাকারিয়া (আ.) এর পুত্র ছিলেন। হযরত হারুন (আ.) ছিলেন হযরত মূসা (আ.) এর ভাই। আরবরা মূলত হযরত ইসমাইল (আ.) এর উত্তরসূরি এবং হযরত মুহাম্মদ (দ.)ও ছিলেন একজন আরব। হযরত হূদ (আ.) কে আদ গোত্রে, হযরত সালিহ (আ.) কে সামুদ গোত্রে এবং হযরত মূসা (আ.) কে বনী ইসরাইল গোত্রে প্রেরণ করা হয়েছিল। এছাড়াও হযরত হারুন, দাউদ, সোলাইমান, যাকারিয়া এবং ইয়াহিয়া (আ.) কেও বনী ইসরাইল গোত্রে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউই নতুন ধর্ম প্রাপ্ত হননি; তারা সকলে বনী ইসরাইলদের হযরত মূসা (আ.) এর ধর্মের প্রতি আহবান করেছিলেন। যদিও যাবুর কিতাব হযরত দাউদ (আ.) এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, এতে কোন আদেশ, বিধান বা ইবাদত ছিল না। এটি শুধু উপদেশ এবং নৈতিকবাক্যে পূর্ণ ছিল। সুতরাং যাবুর কিতাব তাওরাতকে বাতিল কিংবা রহিত করে দেয়নি; বরং তাওরাতকে জোর প্রদান করেছিল, কালক্রমে মূসা (আ.) এর এ ধর্ম (বিধান) হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন অবধি স্থায়ী ছিল। যখন হযরত ঈসা (আ.) এলেন, তখন তাঁর ধর্ম অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) এর ধর্ম বাতিল করে দেয়; অর্থাৎ তাওরাত অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই তখন হযরত মূসা (আ.) এর ধর্ম অনুসরণ করার আর বৈধতা ছিল না। তখন থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন অবধি হযরত ঈসা (আ.) এর ধর্ম অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তবে, বনী ইসরাইলের অধিকাংশ লোক হযরত ঈসা (আ.) কে বিশ্বাস করেনি এবং তারা তাওরাত কিতাবকে অনুসরণ করতে অটল ছিল। ফলশ্রুতিতে, ইহুদি ও নাসারা পৃথক হয়ে গেল। যারা হযরত ঈসা (আ.) কে বিশ্বাস করত তাদেরকে নাসারা বলা হত, যারা বর্তমানে খ্রিস্টান হিসেবে পরিচিত। পক্ষান্তরে, যে লোকেরা হযরত ঈসা (আ.) কে অস্বীকার করেছিল এবং কুফরী ও ধর্মবিরোধে লিপ্ত ছিল, তারা ইয়াহুদ (ইহুদি) বলে অভিহিত হয়েছিল। ইহুদীরা এখনও দাবি করে যে তারা হযরত মূসা (আ.) এর ধর্মকে অনুসরণ করে এবং তাওরাত ও যাবুর পড়ে; অন্যদিকে নাসারারা দাবি করে যে তারা হযরত ঈসা (আ.)এর ধর্মকে অনুসরণ করে এবং ইনজিল পড়ে। তবে, আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়া-সাল্লাম উভয় জগতের সর্দার এবং সমস্ত মানুষ, সকল জ্বীন এর নবী, সমগ্র জাহানের নবী হিসাবে এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ধর্ম ইসলাম পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছিল। যেহেতু এ ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর শেষ অবধি বৈধ থাকবে, তাই এ ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসরণ করা পৃথিবীর কোন অংশে অনুমোদিত নয়। কোন নবীও তাঁর স্লাভিষিক্ত হবেন না। আমরা তাঁর উম্মত হিসেবে মহান আল্লাহু তা'য়ালার করকমলে কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি। আমাদের ধর্ম ইসলাম।
আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সকালে মক্কা মুকাররমায়শুভ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজরির একাদশ বর্ষে (৬৩২ খ্রিস্টাব্দে) মদিনায় ইন্তেকাল করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) ৪০ বছর বয়সে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর কাছে তাঁর নবুয়ত প্রকাশ করেছিলেন। হিজরি ৬২২ সালে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং ২০ সেপ্টেম্বর সোমবার মদিনার নিকটবর্তী কুবা নামক গ্রামে পৌঁছান আর সেসময় থেকে মুসলমানদের হিজরি (সৌর) ক্যালেন্ডারের[৩] সূচনা হয়, যদিও একই বছরের মহররমের শুরু চন্দ্রপঞ্জিকার সূচনা করেন। আমরা সকল নবীকে বিশ্বাস করি। তাঁরা সকলেই আল্লাহু তাআলার প্রেরিত নবী। তবুও, পবিত্র কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম রহিত হচ্ছে যায়। সুতরাং, এগুলোর কোনটিই এখন অনুসরণ করা বৈধ নয়। খ্রিস্টানরাও পূর্ববর্তী সকল নবীকে বিশ্বাস করে, তবুও (যেহেতু) তারা হযরত মুহাম্মদ (দ.) কে সমস্ত মানবজাতির নবী এটা অস্বীকার করে, তাই তারা অবিশ্বাস (কুফরী) এর মধ্যেই রয়েছে এবং সত্য থেকে দূরে সরে আছে। ইহুদিদের ক্ষেত্রে, যেহেতু তারা হযরত ঈসা (আ.) কে বিশ্বাসই করে না, তারা ইসলাম থেকে দ্বিগুণ দূরে রয়েছে। যেহেতু ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের বর্তমান বিকৃত কিতাবগুলোকে এখনও বিশ্বাস করে যে সেগুলো আসমান থেকে অবতীর্ণ করা

---

[৩]. পার্সিয়ান শেমসি বছর এর ছয় মাস আগে শুরু হয়; অর্থাৎ ২০ শে মার্চ, যা ম্যাজিয়ানদের উৎসবের দিন।

মূল-অবিকৃত বইগুলোর মতোই রয়েছে, তাই তাদের আহলে কিতাব বলা হয় (আসমানী কিতাব প্রাপ্ত অবিশ্বাসী)। আল্লাহর নাম উচারণ করে তারা যে পশু জবাই করে, তার মাংস খাওয়া জায়েজ [কিন্তু মাকরূহ] এবং নিকাহের মাধ্যমে তাদের কন্যাদের বিবাহ করা বৈধ। [মুসলিম মেয়েদের জন্য এ পুরুষ কাফিরদের কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। যদি কোন মুসলিম মেয়ে কাফির বা মুরতাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তবে সে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধর্মকে তুছ করবে। আর যেব্যক্তি ইসলামকে তুছ করে, সে ইসলাম থেকে বের হচ্ছে মুরতাদ হচ্ছে যাবে। তথাকথিত বিবাহটি হবে দুজন কাফিরের বিয়ে]।

মুশরিক এবং মুরতাদ, যারা কোন নবী বা কিতাবে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে বলা হয় আসমানী কিতাব ব্যতীত কাফির। মুলহিদকেও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। তাদের কন্যাদের বিয়ে করা কিংবা তাদের জবেহকৃত পশু খাওয়া বৈধ নয়।

হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পরে ধর্ম প্রচার করার জন্য তাঁর বারোজন সঙ্গীকে মনোনীত করেছিলেন; তাদের প্রত্যেককে হাওয়ারী [দূত] বলা হতো। তারা হলে-শামূন [সাইমন], পিটার [পেট্রোস), জোহানা [জোহানেস), বড় ইয়াকুব, আন্দ্রেস [অ্যান্ড্রু, পিটারের ভাই], ফিলিপাস, থমাস, বার্থলোমিউ [বার্থোলোমাস], মাতিয়া [ম্যাথিউ], ছোট ইয়াকুব, বার্নাবাস, ইয়াহুদা [জুডাস] এবং থাডেয়ুস [জ্যাকোবি]। ইয়াহুদা ধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং ম্যাটিয়াস [ম্যাথিয়াস] তাঁর স্থান গ্রহণ করেছিলেন। হাওয়ারিদের প্রধান ছিলেন পেট্রোস। পরবর্তীতে ত্রিশ বছর বয়সে হযরত ঈসা (আ.) কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর এ বারো বিশ্বাসীগণ তাঁর ধর্মকে প্রচার করার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত ধর্মের আসল শিক্ষা কেবল আশি বছর যাবত বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে, পলের মিথ্যা মতবাদগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পল ছিল একজন ইহুদি যে হযরত ঈসা (আ.)'র উপর বিশ্বাসী ছিল না। তবুও সে নিজেকে ঈসা (আ.) এর বিশ্বাসী হিসেবে তুলে ধরেছিল এবং নিজেকে একজন ধর্মীয় পণ্ডিত হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেছিল, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র ছিলেন। সে আরও কিছু জিনিস বানিয়ে বলে যে মদ ও কূকরের মাংস হালাল। সে নাসারাদের কিবলাকে কাবা দিক হতে সরিয়ে পূর্ব দিকে যেদিকে সূর্য ওঠে, ওদিকে রুপান্তর করে দিয়েছিল। সে বলেছিল যে আল্লাহ তা'য়ালার ব্যক্তি (দূত) ছিলেন একজন এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি। এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে উকনুম (হাইপোস্টেসিস) বলা হয়। এ ভণ্ড ইহুদির ব্যবহৃত বাণী বাইবেলের আদি চারটি বইতে (Gospels) বিশেষত লুকের বইতে সন্নিবেশিত হয়েছিল এবং নাসারারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাহাত্তরটি মতবিরোধী গোষ্ঠী এবং বই এর উদ্ভব হল। কালক্রমে এ সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং এখন তাদের মধ্যে কেবল তিনটি প্রধান গোী রয়ে গেছে, যাদের বেশিরভাগই মুশরিক।

[আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আত-তারজুমান, যিনি স্পেনীয় বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম মেজরকার পুরোহিত ছিলেন এবং তিউনিসিয়ায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর যিনি নিজের নাম পরিবর্তন করেছিলেন, তিনি আরবী ভাষায় তুহফা-ত-উল-এরিব ফির-রদ্দ-ই-আহলিস-সালিব শিরোনামে (হিজরি) বছরে [১৪২০ খ্রিস্টাব্দে] একটি বই লিখেছিলেন এবং আরবী ভাষায় ১২৯০ সালে [১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে] লন্ডনে আর ইস্তাম্বুলে ১৪০১ সালে [১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে] বইটি পুনরায় ছাপা হয়েছিল; বইটির মূল আরবী সংস্করণ হাকিকাত কিতাবেবী রচিত আল-মুনকিদু আনিদ্দালাল বইটির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল এবং একই প্রতিান কর্তৃক বইটির একটি তুর্কি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন :

ম্যাথিউ, লূক, মার্ক এবং জন [জোহানা] চারটি সমাচার (গসপেল)] লিখেছিলেন। ইনজিলকে বিকৃত করার জন্য এগুলো প্রথম বই ছিল। ফিলিস্তিনের ম্যাথিউ হযরত ঈসা (আ.) কে কেবল তাঁর আসমানে আরোহণের বছর দেখেছিল। আট বছর পরে তিনি প্রথম সমাচার (Gospel) টি (কিতাব/ পুস্তক) লিখেছিলেন, যেখানে তিনি ফিলিস্তিনে দেখা অসাধারণ ঘটনাগুলো যেমন–হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম এবং হযরত মরিয়ম আলাইহাস-সালাম যখন ইহুদি রাজা হেরোড তাঁর সন্তানকে হত্যা করতে চেয়েছিল কীভাবে তাঁকে মিশরে নিয়ে গিয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) এর আসমানে আরোহিত হওয়ার ছয় বছর পরে হযরত মরিয়ম (আ.) ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে জেরুজালেমে সমাহিত করা হয়। অ্যানতিকা হতে আগত লূক কখনও হযরত ঈসা (আ.) কে দেখেন নি। তিনি হযরত ঈসা (আ.) এর আসমানে আরোহণের অনেক পরে ভণ্ডপল কর্তৃক ঈসা (আ.) এর ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। পলের বিষাক্ত মতবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার পরে ইনজিলকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে তিনি তার সমাচার (Gospel) লিখেছিলেন। মার্কও হযরত ঈসা (আ.) এর

আসমানে আরোহনের[৪] পর তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি রোমে ইঞ্জিলের নামে পেট্রোসের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তা লিখেছিলেন। Jhon জন ছিলেন হযরত ঈসা (আ.) এর খালার ছেলে। তিনি হযরত ঈসা (আ.) কে বেশ কয়েকবার দেখেছিলেন। এ চারটি সমাচারে (Gospel) (পুস্তিকা) অনেকগুলো বেমানান অনুচ্ছেদ রয়েছে। "

দিয়া আল-কুলুব ও শামস আল-হাকিকা শিরোনামের দুটি বই যা হরপুতের ইসহাক এফেন্দি লিখেছেন, যিনি ১৩০৯ (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) এ মারা গিয়েছিলেন; আরবী ভাষায় রচিত সিরাত আল-মুস্তাকিম শীর্ষক বই যা হায়দারি জাদা ইবরাহিম ফাসিহ রচিত, যিনি ১২৯৯ হিজরি সালে মারা যান; নাজাফ আলি তাব্রাজি রচিত পার্সিয়ান ভাষার মিজান আল-মাওয়াজিন, যা ১২৮৮ হিজরিতে ইস্তাম্বুলে ছাপা হয়েছিল এবং হযরত ইমাম আল-গাজ্জালী (রহ.) রচিত আরবী ভাষার বই আর-রাদ আল জামিল, যা ১৯৫৯ সালে বৈরুতে ছাপা হয়েছিল, উল্লেখিত গ্রন্থগুলোতে প্রমাণিত হচ্ছে, বাইবেলের বর্তমান অনুলিপিগুলো বিকৃত হয়ে গিয়েছে।[৫]

বার্নাবাসের লেখা একটি এড়ংঢ়বষ (যীশুর উপদেশাবলি), যিনি ঠিক ওই বিষয়গুলো লিখেছিলেন যা তিনি দেখেছেন এবং হযরত ঈসা (আ.) এর কাছ থেকে শুনেছেন। তাঁর লিখা এ গ্রন্থটি পাকিস্তানে পাওয়া গিয়েছিল এবং ১৯৭৩ সালে এটি ইংরেজিতে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। কামুস আল আলাম বইয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে- "বার্নাবাস প্রথম পর্যায়ের একজন হাওয়ারি ছিলেন যিনি মার্কের মামার ছেলে ছিলেন। আর মার্ক হলেন একজন গণক, যিনি হযরত ঈসা (আ.) এ বিশ্বাসী ছিলেন এবং পল আবির্ভূত হওয়ার পর তার সাথে তিনি আনাতোলিয়া এবং গ্রিসে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ৬৩ বছর বয়সে সাইপ্রাসে শহিদ হন। তিনিও একটি এড়ংঢ়বষ (যীশুর উপদেশাবলি) এবং অন্যান্য কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। খ্রিস্টানরা তাকে ১১ই জুন স্মরণ করে। "

খ্রিস্টান ধর্মীয় আধিকারিদের বলা হয় পাদ্রী। উচ্চপদস্থ অর্থোডঙ পাদ্রীদের প্যাট্রিয়াক (গৃহপতি) বলা হয় আর মধ্যবর্তী স্তরের পাদ্রীদের যাজক বলা হয়। যারা বাইবেল অধ্যয়ন করে , তাদেরকে কিসিস (গসপেলারস) বলা হয়। কিসিসের উপরের স্তর হচ্ছে উসকুফ (প্রেসবিটার্স), যারা মুফতি হিসাবে কাজ করে। উচুঁ স্তরের উসকুফসদের বলা হয় বিশপ, যার উপরে আর্চবিশপ বা মেট্রোপলিটন রয়েছে, যারা বিচারক হিসেবে কাজ করেন। যাঁরা চার্চ/গীর্জার ধর্মীয় আচারাদি পরিচালনা করেন, তাদেরকে যাসিলিক (আলেম) বলা হয়, যার নীচে কারুস বা শাম্মাস (সবচেয়ে নিম্নস্তরের পাদ্রি) রয়েছে। আর যারা গির্জায় পরিবেশক হিসেবে থাকেন, তাদের ইরিমিটস (সন্ন্যাসী) বা শামামিসা (মঠবাসী) ডাকা হয়, যাদের দায়িত্ব উপাসকদের সাহায্য করা। যারা ইবাদতে নিজেদের নিবেদিত করেছেন, তাদেরকে গড়হশ বা সন্ন্যাসী বলা হয়। ক্যাথলিকদের প্রধান হলেন রোমের পোপ (পিতাদের পিতা)। তাঁর পরামর্শদাতা প্রিলেটদের বলা হয় কার্ডিনাল।

অতীতের ধর্মীয় কর্তৃত্বের এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহ তা'য়ালার একত্ব ভুলে গিয়েছিল এবং তারা Trinity/ত্রিত্ববাদ এর উদ্ভব ঘটিয়েছিল। তারা বলেছিল যে ঈসা (আ.) হলেন আল্লাহর পুত্র, যা তাদের মুশরিক করেছিল। কিছু সময়ের পরে, রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লাডিয়াসের যুগে [২১৫-২৭১ খ্রি.], এন্টিওকের পৃপোষক ইউনুস শামাস আল্লাহু তা'য়ালার একত্ব ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বহু লোককে সঠিক পথে নিয়ে এসেছিলেন, যার দ্বারা তারা কিতাবের লোকদের সাথে যোগ দেয়। তবুও পরবর্তীতে পুরোহিতরা আল্লাহর পরিবর্তে তিন দেবতার উপাসনায় ফিরে আসেন। কনস্টানটাইন দ্য গ্রেট [২৭৪-৩৩৭ খ্রি.] ঈসা (আ.')র ধর্মের সাথে মূর্তিপূজাকে মিশ্রিত করেন। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাইসিয়ায় (ইজনিক) একটি আধ্যাত্মিক কাউন্সিলে ৩১৮ জন পুরোহিতকে ডেকে এক নতুন খ্রিস্টান ধর্ম গঠন করেছিলেন। এ কাউন্সিলে, আরিয়াস নামের একজন সভাসদ বলেন, যে আল্লাহু তা'য়ালা এক এবং ঈসা (আ.) তাঁর সৃ।" তাই কাউন্সিলের প্রধান এবং আলেকজান্দ্রিয়ার তৎকালীন পিতৃপতি আলেকজান্দ্রিয়াস তাকে গির্জা থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। কনস্টান্টাইন দ্যা গ্রেট গোষণা দিলেন যে আরিয়াস অবিশ্বাসী এবং মালাকিয়া (মেলচাইট) সম্প্রদায়ের নীতি প্রতি করেছিলেন; এ ব্যাপারটি আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল গ্রন্থে এবং জিরজিস ইবনে আল-আমিদ কর্তৃক রচিত একটি ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত রয়েছে, জিরজিস ইবনে আল-আমিদ ছিলেন বাইজেন্টাইন গ্রীক ইতিহাসবিদ যিনি ৬০১-৬৭১ হিজরিতে [১২০৫-১২৭৩ খ্রি.] পর্যন্ত দামেস্কে বসবাস করেছিলেন। ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে (ইস্তাম্বুল) দ্বিতীয় কাউন্সিল অনুতি হয়েছিল এবং মাকডনিয়াস এর বিরুদ্ধে নিন্দার অভিযোগ আনা হয়েছিল। কারণ তিনি বলেন, যে ঈসা (আ.) রুহুল কুদ্দুস [পবিত্র আত্মা] নয়, বরং তিনি

---

[৪]. প্রসঙ্গত, খ্রিষ্টানদের মিথ্যা বিশ্বাসের বিপরীত চিত্রে উর্ধ্বারোহণ হলো– তেত্রিশ বছর বয়সে হযরত ঈসা (আ.) এর জীবতাবস্থায় আসমানে উর্ধ্বগমন) । এই সত্য সব ইসলামিক উৎস থেকে পাওয়া যায়। দয়া করে Could not answer এই শিরোনামের বইটি দেখুন, বইটি হাকিকত কিতাবেভী থেকে পাওয়া যায়।

[৫]. শেষ তিনটি বইয়ের একটি ফোটোস্টিক পুনঃ প্রকাশ ১৯৮৬ সালে হাকিকাত কিতাবেভী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

একজন সৃষ্টজীব। ৩৯৫ সালে রোমান সাম্রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ৪২১ সালে কনস্ট্যান্টিনোপলের পিতৃপুরুষ নেস্টোরিয়াসের একটি বই যাচাই বাছাই করার জন্য কনস্টান্টিনোপলে একটি তৃতীয় কাউন্সিল অনুতি হয়েছিল। তিনি বলেন,, "ঈসা (আ.) একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর উপাসনা করা যায় না। সেখানে কেবল দুটি উকনুম রয়েছে। আল্লাহ এক। তাঁর গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে-অস্তিত্ব, জীবন ও জ্ঞান, জীবন বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে রুহুল কুদস বা পবিত্র আত্মা; জ্ঞান বৈশিষ্ট্যটি হযরত ঈসা (আ.) এর অভ্যন্তরে প্রবেশের কারণে তিনি দেব হচ্ছে উঠেছিলেন। মরিয়ম (আ.) কোনও দেবতার (গ্রষ্টা) মা ছিলেন না, তিনি একজন মানুষের মা ছিলেন। ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। "তার এ ধারণাটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। নেস্টোরিয়াস গোষ্ঠীটি প্রাচ্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ সম্প্রদায়ের লোকেরা নেস্টোরিস (নেস্টোরিয়ানস) নামে অভিহিত হত। ৪৩১ সালে, এফিসাসে চতুর্থ কাউন্সিল অনুতি হয়েছিল, যেখানে ডায়োসকোরাসের ধারণাগুলো গৃহীত হয়েছিল এবং নেস্টোরিয়াস [মৃঃ ৪৩৯, মিশর] নিন্দার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। বিশ বছর পরে, ৪৫১ সালে কাদেকিয়ায় পঞ্চম কাউন্সিলে ৭৩৪ জন পুরোহিত একত্রিত হয়েছিলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ার পিতৃপুরুষ ডায়োসকোরাসের লেখার খণ্ডন করেছিলেন। ঈসা (আ.) কে ঈশ্বর হিসাবে ভিত্তি করে তৈরি ডায়োসকোরাসের ধারণাগুলো মনোফিসাইট তৈরি করেছিল, যাকে ডায়োসকোরাসের আসল নাম ইয়াকুব (জ্যাকব) থেকে প্রাপ্ত ইয়াকুবিয়া গোী বলা হতো।

তৎকালীন বাইজেন্টাইন সম্রাট মার্কিয়ানুস সর্বত্র প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। ডায়োসকোরাস পালিয়ে গিয়ে জেরুজালেম ও মিশরে তাঁর বিশ্বাস প্রচার করেছিল। তার অনুসারীরা হযরত ঈসা (আ.) এর উপাসনা করে। আজকের সূরয়ানিস (সিরিয় ভাষায় খ্রিস্টান) এবং ইরাক, সিরিয়া এবং লেবাননের ম্যারোনাইটদের ইয়াকুবিয়া গোীর অনুসারী বলা হয়। ড্যানের মেরোনিটস কাদিকয় কাউন্সিলে গৃহীত এবং রাজা মার্কিয়ানাস কর্তৃক অনুমোদিত এ সম্প্রদায়কে মালাকাইয়া (মেলচাইট) বলা হয়। এটি নাইসিয়ায় অনুতি প্রথম একিউম্যানিকাল কাউন্সিলে গৃহীত সম্প্রদায়ের অনুরূপ। তাদের প্রধান হলেন অ্যান্টিওকের পিতৃপতি। তারা জ্ঞান এবং জীবন এ বৈশিষ্ট্যগুলো যথাক্রমে কালিমা (শব্দ) এবং রুহুল-কুদস (পবিত্র আত্মা) হিসাবে অভিহিত করে, যখন তারা মানুষের সাথে একত্রিত হয় তখন তা উকনাম নামে অভিহিত হয়। তাদের তিনটি দেবতা রয়েছে : পিতা, যার অস্তিত্বের ইকনুম, তাদের মধ্যে অন্যতম; যীশু হলেন পুত্র; মেরি (মরিয়ম) একজন দেবী। তারা ঈসা (আ.) কে যীশু খ্রিষ্ট বলে ডাকে। বাহাত্তরটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিবরণ আরবি গ্রন্থ ইজাহরুল হক এবং তুর্কি গ্রন্থ দিয়া-উল-কুলুব-এ বিশদভাবে বর্ণিত হচ্ছে।[৬]

এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলো ৪৪৬ সাল [১০৫৪ খ্রি.] অবধি রোমের পোপের প্রতি অনুগত ছিল। সামগ্রিকভাবে তাদের বলা হত ক্যাথলিক। ১০৫৪ সালে, কনস্টান্টিনোপলের পিতৃপতি মাইকেল সিরোলারিয়াস পোপের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব-দেশীয় গীর্জাগুলো পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন। এ চার্চ বা গীর্জাগুলোকে অর্থোডক্স বলা হয়। তারা ইয়াক্বিয়্যা সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে। ৯২৩ সালে [১৫১৭ খ্রি] জার্মান পুরোহিত লুথার রোমে পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং বেশ কয়েকটি গীর্জা তাঁকে অনুসরণ করেছিল। তাদের প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হয়। যেমন দেখা যায়, বেশিরভাগ খ্রিস্টান ইহুদিদের তুলনায় নিকৃষ্ট এবং আখেরাতে তাদের আরও কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে কারণ তারা উভয়ই হযরত মুহাম্মদ (দ.) কে অস্বীকার করে এবং ঊলুহিয়্যত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে; ত্রিত্ববাদকে বিশ্বাস করে এবং ঈসা (আ.) ও তাঁর মা মরিয়ম (আ.) এর ইবাদাত করে এবং তাদের দেবতা মনে করে; তারা মৃত প্রাণীর মাংস[৭]ও খায়। ইহুদিদের ক্ষেত্রে, তারা দু জন নবীকে অস্বীকার করে; তবে তারা জানে যে আল্লাহু তা'য়ালা একজন, এবং তারা মৃত প্রাণীর মাংস খায় না। তবু ইহুদিরা অধিকতর ইসলামবিদ্বেষী হয়। খ্রিষ্টানদের মতো "উযাইর (এযর) আল্লাহর পুত্র" একথা বলে যদিও কিছু ইহুদি মুশরিক হয়ে গিয়েছিল, তথাপি, তাদের আহলে কিতাব বলা হয়। অর্থোডক্স, ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টরা

---

[৬]. ইজহার আল-হক্ক ১২৮০ হিজরি [১৮৬৪ খ্রি.] ইস্তাম্বুলে আরবিতে ছাপা হয়েছিল। এই বইটিতে ভারতের রহমতুল্লাহ এফেন্দি (রহ.), যিনি ১৩০৬ হিজরিতে মক্কায় ইন্তেকাল করেছেন, তিনি ১২৭০ সালে ভারতে এবং পরে ইস্তাম্বুলের খ্রিস্টান পুরোহিতদের সাথে তাঁর যে আলোচনা করেছিলেন তা নিয়ে বিশদভাবে লিখেছেন এবং তিনি কীভাবে তাদেরকে চুপ করে রেখেছিলেন তাও বলেছেন। এই আলোচনার উপর মন্তব্যগুলো পার্সিয়ান বই সাইফ আল-আবরারের ইস্তাম্বুলের মুদ্রণে যুক্ত হয়েছিল। ইজহার আল-হক এর দুটি অংশ রয়েছে: প্রথম অংশ যা তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রধান সেক্রেটারি নাজেত এফেন্দি, যেটি ইস্তাম্বুলে ইদহ আল-হক্ক নামক শিরোনামে ছাপানো হয়েছিল; দ্বিতীয় অংশটি ১২৯২ হিজরিতে সাইয়িদ ওমর ফেহমী বিন হাসান তুর্কি অনুবাদ করেছিলেন এবং বসনিয়াতে ইবরাজ আল-হক শিরোনামে ১২৯৩ হিজরিতে (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) মুদ্রিত হয়েছিল। হরপুতের ইসহাক এফেন্দি কর্তৃক রচিত দিয়া উল-কুলুব নামক গ্রন্থটি ঈড়ঁষফ হড়ঃ অহংবিৎ শিরোনামে ১৯৯০ সালে ইস্তাম্বুলে ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছিল।

[৭]. ইসলাম কীভাবে খাওয়ার উপযুক্ত প্রাণীকে জবেহ করা হবে তার নির্দেশ দিয়েছে। যখন এটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে জবেহ করা হয় না, তখন এর মাংস লাশ হয়ে মাইত হয়ে যায়, অর্থাৎ খাওয়ার যোগ্য নয়।

বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ পড়ে এবং দাবি করে যে তারা হযরত ঈসা (আ.) কে অনুসরণ করে। যাই হোক, প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্ম ও অনুশীলনের বিষয়ে অনেকগুলো বিরোধপূর্ণ নীতি রয়েছে। সার্বজনীনভাবে, তারা নাসারা, খ্রিস্টান ও আহলে কিতাব নামে পরিচিত। ইহুদিরা নিজেদের হযরত মূসা (আ.)'র ধর্মের অনুসারী বলে মনে করে।[৮]

যখন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের একাদশতম বছরে তাঁর উপস্থিতিতে আখেরাতকে (ইন্তেকালের মাধ্যমে) সম্মানিত করেছিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলিফা হয়েছিলেন। হিজরতের তেরোতম বছরে তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁর পরে হযরত উমর ফারুক (রা.) খলিফা হয়েছিলেন। তিনি হিজরতের তেইশতম বছরে তেত্রিশ বছর বয়সে শহিদ হন। তাঁর পরে হযরত উসমান যুন-নুরাইন খলিফা হয়েছিলেন এবং হিজরতের ৩৫ তম বছরে তিনি বিরাশি বছর বয়সে শহিদ হয়েছিলেন। এরপরে হযরত শেরে খোদা আলী (রা.) খলিফা হয়েছিলেন এবং ৪০ হিজরিতে তিনি তেষট্টি বছর বয়সে শহিদ হন। এ চার খলিফাকে খোলাফায়ে রাশেদিন বলা হয়। শরীয়তের বিধিবিধান (আহকাম) ঠিক যেমনভাবে প্রণীত হয়েছিল ঠিক তেমনই ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা তাদের খেলাফতকালে সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিল। শরীয়তের বিধিবিধান কোন প্রকার ত্রুটি ছাড়াই কার্যকর করা হয়েছিল। এ চারজন খলিফা সকল সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে উচুঁ পর্যায়ের ছিলেন। এবং খেলাফতের ক্রমানুসারে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে মুসলিমরা আরব উপদ্বীপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের ইন্তেকালের পরে আরব উপদ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। আবু বকর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে বিদ্রোহকে দমন করেছিলেন ও মুরতাদদের সংশোধন করতে সংগ্রাম করেছিলেন এবং মুসলিম একতাকে পুনরায় প্রতিতি করেছিলেন, যেমনটি আসর-আস-সা'দার সময় ছিল। হযরত উমর (রা.) যখন খলিফা হয়েছিলেন, তখন তিনি একটি ভাষণ দিয়েছিলেন :

হে সাহাবায়ে রসূল! রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। আরব আপনাদের ঘোড়াগুলোর জন্য কেবল বার্লি সরবরাহ করতে পারে। তবুও, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয়তম (নবী) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর উম্মতকে পৃথিবীর সবর্ত্র তাদের আবাসভূমি করে দিবেন। এ প্রতিশ্রুত দেশগুলো জয় করার জন্য, গণিমত লাভ করার জন্য এবং পরকালে গাজী ও শহিদের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার জন্য সৈন্যরা কোথায়? গাজীরা কোথায় আছে যারা নিজের জীবন এবং মস্তক উৎসর্গ করবে এবং ইসলামের স্বার্থে নুির পাঞ্জা থেকে আল্লাহু তা'য়ালার বান্দাদের উদ্ধার করতে ঘর ছেড়ে দিবে?।"

এ কথাগুলোর সাহায্যে তিনি সাহাবীদেরকে জিহাদ ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) এ ভাষণই তিনটি মহাদেশে ইসলামি দেশের দ্রুত সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করেছিল এবং লক্ষলক্ষ লোককে কুফরী থেকে মুক্ত করে মুসলিম (বিশ্বাসী) বানিয়েছিল। এ ভাষণের পর সাহাবায়ে কেরামগণ জেহাদ করার এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলামের পক্ষে লড়াই করার সর্বসম্মত শপথ গ্রহণ করেছিলেন। খলিফার আদেশ অনুসারে সশস্ত্র বাহিনী সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানরা তাদের গৃহ ত্যাগ করে আরব থেকে বের হচ্ছে সর্বত্র স্থায়ী হওয়া শুরু করেছিল। তাদের বেশিরভাগই ফিরে আসেনি এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেখানে তারা গিয়েছে সেখানে লড়াই করেছিল। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক দেশ বিজিত হয়েছিল। সেই সময়ে, দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্য ছিল : বাইজেন্টাইন এবং পারস্য। মুসলমানরা উভয়টিই পরাভূত করেছিল। বিশেষত পারস্য সাম্রাজ্য পুরোপুরি ধসে পড়েছিল এবং তাদের সমস্ত জমি মুসলমানদের দখলে চলে এসেছিল। এ দেশগুলোর বাসিন্দারা মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করে এ দুনিয়াতে শান্তি লাভ করেছে এবং পরকালে অফুরন্ত সুখ লাভ করেছে। হযরত উসমান (রা.) ও আলী (রা.) এর সময়েও মুসলমানরা নিজেদের গাজায় নিবেদিত করেছিল। তবুও, উসমান (রা.) এর খেলাফতকালে কিছু লোক খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে হত্যা করেছিল। হযরত আলী (রা.) এর সময়ে খারেজী বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ শুরু হচ্ছে যায়। যেহেতু সেসময় বিজয়ের উৎস ছিল সর্বসম্মত ঐক্য, তাদের খেলাফতকালে অনেক ভূখণ্ড অধিকৃত হলেও হযরত উমর (রা.) এর সময়কার মত হয়নি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ত্রিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ ত্রিশ বছর নবীজি (দ.) এর সময়ের মতো সমৃদ্ধির সাথে অতিবাহিত হয়েছিল। তাদের পরে, মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিদ'আত এবং ভুল পথের দেখা মিলে যার ফলে অনেক

---

[৮]. দ্বি-খণ্ডবিশিষ্ট এনসাইক্লোপিডিয়ায় ধর্মের ব্যাপারে বলা হয়েছে: ১৯৯৫ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৪.৫৫০ বিলিয়ন। ১.০৬০ বিলিয়ন মুসলমান, ১.৮৭০ বিলিয়ন খ্রিস্টান [যার মধ্যে ১.০৪২ বিলিয়ন ক্যাথলিক, ০.৫০ বিলিয়ন প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ০.১৭৪ বিলিয়ন অর্থোডঙ খ্রিস্টান ছিল], ০.১৪০ বিলিয়ন ইহুদী এবং ১.৬৬০ বিলিয়ন মুশরিক ও অবিশ্বাসী ছিল , যারা কোন আসমানী কিতাব বা নবীকে বিশ্বাস করতো না।

লোক সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র যারা বিশ্বাসী ছিল ও সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে শরীয়াহকে পাল্ন করেছেন ঠিক সেভাবেই নিজেদের গড়ে নিয়েছিল, তারাই সঠিক পথে অটল থাকতে পেরেছিল। আর তাদের অনুসরণীয় পথটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এটিই একমাত্র সঠিক পথ। আমাদের নবী (দ.) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যে পথ অনুসরণ করেছিলেন ঠিক সেই পথই আহলে সুন্নাহর আলেমগণ দেখিয়েছেন। কালের গর্ভে পূর্বের ভ্রান্ত পথগুলো বিলীন হচ্ছে যায় এবং বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলো এ সঠিক পথ অনুসরণ করতে শুরু করেছে। যাদের সাথে আহলে সুন্নাহর সামঞ্জস্য ছিলো না, তারা হলো শিয়া সম্প্রদায়। শিয়াদের দাবী হলো, হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর পরবর্তী খেলাফতের উত্তরাধিকারী ছিল হযরত আলী (রা.) কিন্তু হযরত আবু বকর এবং ওমর (রা.) জোরপূর্বক তাঁকে বঞ্চিত করেছে" এছাড়াও তারা অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামদের সমালোচনা করে। [বর্তমানে আহলে সুন্নাহ, শিয়া আর ওয়াহাবিরাই মূলত মুসলিম হিসেবে পরিচিত এবং উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে পরিগণিত][৯]

আহলে সুন্নাহ, বিধিবিধান পালন ও ইবাদত পালনে চার মাযহাব নিয়ে গঠিত। প্রথমটি হানাফি মাযহাব যা ইমাম আযম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবিত (রহ.) প্রতি করেছিলেন। হানিফ অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি ইসলামকে আঁকড়ে ধরেন এবং তা সঠিকভাবে বিশ্বাস করেন। আর আবু হানিফা অর্থ সত্যিকার মুসলিমদের পিতা। ইমাম আজমের হানিফা নামে কোন মেয়ে ছিল না। আহলে সুন্নাহর চার মাযহাবের দ্বিতীয় মাযহাব হলো মালেকী মাযহাব, এটির প্রতিতা হলেন ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ.)। তৃতীয়টি হলো শাফেয়ি মাযহাব, যা প্রতি করেছেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস শাফেয়ি (রহ.)। সাহাবী হযরত শাফী ছিলেন ইমাম শাফেয়ি (রহ.)'র দাদার পিতামহ। এজন্য তাঁকে এবং তাঁর মাযহাবকে শাফেয়ী মাযহাব বলা হয়।

চতুর্থটি হলো হাম্বলী মাযহাব। আর এ মাযহাবের প্রতিতা হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। [যেমনটি ইবনে আবেদীনের রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের ভূমিকায় বর্ণিত হচ্ছে, এ চারজন ইমাম যথাক্রমে হিজরি ৮০, ৯০, ১৫০ [৭৬৭ খিষ্ট্রাব্দ] এবং ১৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যথাক্রমে ১৫০, ১৭৯, ২০৪ এবং ২৪১ হিজরি সালে ইন্তেকাল করেছিলেন।

ই'তিকাদ এর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এ চার মাযহাব (ইমামগণ) একটি অন্যটি থেকে পৃথক নয়। এরা সকলেই আহলে সুন্নাহর অনুসারী এবং তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের ভিত্তি একই। মুসলমানদের এ চার ইমাম ছিলেন প্রত্যেকের নিকট স্বীকৃত এবং বিশ্বাসযোগ্য মহান মুজতাহিদ। তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ছোট ছোট আহকামে শরীয়তের বিধিবিধান পালনে মতপার্থক্য রয়েছে।

কারণ আল্লাহু তা'য়ালা এবং তাঁর নবী কারিম (দ.) মুসলমানদের প্রতি দয়া করে করে কিছু বিষয় কিভাবে পালন করা উচিত তা আল কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেননি।[১০] এ অঘোষিত ও অমিমাংসিত বিধিবিধানগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধানাবলির আলোকে পালন করতে হবে। ধর্মীয় আলেমদের মধ্যে যারা এসব অঘোষিত বিষয় এটা ওয়াজিব ছিল, অর্থাৎ, একজন মুজতাহিদের জন্য পবিত্র কুরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফের নির্দেশনা হচ্ছে-তিনি তার নিজের জন্য এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করে তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিধান কিভাবে আদায় করা হবে, তার স্বীয় সিদ্ধান্ত বা অভিমত (ইজতিহাদ) অনুযায়ী তা আদায়পদ্ধতি বের করতে তার সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো, যা তিনি ইজিতেহাদ করে বের করেন, সেটাই খুব সম্ভবত সঠিক ব্যাখ্যা। এরূপ মাসয়ালা অন্বেষণের ক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদের কোনো ভুল পাপ হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তার কৃত অনুসন্ধানের কারণে আখিরাতে তার প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করা হবে। কেননা, মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী কাজ করার জন্য নির্দেশিত। তিনি যদি ভুল করেন, তবে তাঁকে পুরস্কার হিসেবে একগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তিনি যদি সঠিক মাসয়ালাটি আবিষ্কার করতে পারেন, তবে তার পুরষ্কার হিসেবে আখিরাতে কৃতকর্মের দশগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। সমস্ত সাহাবায়ে কেরামও একেকজন বিখ্যাত পণ্ডিত তথা মুজতাহিদ ছিলেন। সাহাবীদের পরবর্তী সময়ের লোকদের মাঝে ইজতিহাদ করতে সক্ষম এমন অনেক আলেম ছিলেন, অনেক লোকই যাদের অনুসারী ছিলেন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের অধিকাংশকেই মানুষ ভুলে গিয়েছিল এবং আহলে সুন্নাহর মধ্যে কেবল এ চারজন

---

[৯]. জিন্দিক যাদের আহমদিয়া (কাদিয়ানী) বলা হয়, বাহায়ী, ভারতে ইংরেজ বিশ্বাসঘাতক কর্তৃক প্রতিতি মতবিরোধপূর্ণ দুটি গোীর অনুসারীরা, লা-মাযহাবী এবং তাবলীগ জামাতের ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। (কাদিয়ানী, তাবলীগ, লা-মাযহাবী) এই তিনটি গ্রুপ আহলে সুন্নাত থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। দয়া করে উহফষবংং নষরংং নামক বইটির দ্বিতূয় খণ্ডের ছত্রিশতম অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখুন।

[১০]. এই বিধানগুলো যদি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হত, তবে তা আল্লাহ ও রসুলের ঘোষণা মোতাবেক পালন করা ফরজ কিংবা সুন্নাত হতো। এক্ষেত্রে যারা এসব ফরজ আদায় না করতো, তারা গুনাহগার হিসেবে গণ্য হতো আর যারা অবহেলা করতো, তারা অমুসলিম হিসেবে গণ্য হতো। তখন মুসলমানদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে উঠতো, যেটা আল্লাহ ও তার রসুল (দ.) মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন নি।

ইমামের চারটি মাযহাবই এখনও অক্ষত আছে। পরবর্তীতে, পাছে এমন কেউ বেরিয়ে এসে মুজতাহিদ হওয়ার ভান করে এবং একটি ভিন্ন মতের দল গঠন করে বসে, তাই আহলে সুন্নাহর অনুসারীরা চারটি মাযহাব ব্যতীত বাকী উদ্ভূত কোন দলকে স্বীকার করে না।

আহলে সুন্নাহর কোটিকোটি লোক এ চারটির মধ্যে যেকোন একটি মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে। যেহেতু এ চার মাযহাবের বিশ্বাস একই, তাই তারা একে অপরকে ভুল মনে করে না এবং একে অপরের কর্মকাণ্ডকে বিদ'আত কিংবা শরীয়তপন্থী হিসেবেও কেউ আখ্যা দেয় না। এ চার মাযহাবের পথই সঠিক পথ এটা বলার পর, একজন মাযহাবের অনুসারী অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে নিজের অনুসৃত মাযহাবকেই অত্যধিক সঠিক বলে মনে করে। যেহেতু ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া বিধানাবলি কিভাবে আদায় করতে হবে তা ইসলাম সুস্পষ্টরূপে বলে দেয় নি, তখন কারো নিজস্ব মাযহাবটি ভুল এবং বাকী তিন মাযহাবের একটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; আর প্রত্যেকের এটি বলা উত্তম যে "আমার নিজের অনুসৃত মাযহাবটি সঠিক কিন্তু এটি ভুলও হতে পারে, তাছাড়া বাকী তিনটি মাযহাব ভুল কিন্তু কোন একটি সঠিকও হতে পারে। "যদি কোন জটিলতা (অসুবিধা, ঝামেলা) দেখা না দেয়, তবে এক মাযহাব অনুসারে একটি কাজ করা ও অন্য মাযহাব অনুসারে অন্য কাজ করে চারটি মাযহাবের সংমিশ্রণ করার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। যখন নিজ মাযহাবের মধ্যে কোন সমস্যা নেই সুতরাং একজন ব্যক্তিকে তার অনুসৃত মাযহাবের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে।[১১]

অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, হানাফি মাযহাব সর্বোচ সঠিক হওয়ার সম্ভাব্যতা রাখে। অতএব, এ মাযহাব বেশিরভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে প্রসারিত এবং অনুসৃত। তুর্কিস্তান, ভারত এবং আনাতোলিয়ার প্রায় সমস্ত মুসলমান হানাফি মাযহাবের অনুসারী। পশ্চিম আফ্রিকা পুরোপুরি মালেকী মাযহাবভুক্ত। আর ভারতের কিছু উপকূলীয় অঞ্চলেও মালেকী মাযহাবের অনুসারী দেখা যায়। কুর্দিদের মধ্যে, মিশর, আরব এবং দাঘিস্তানে প্রচুর পরিমাণে শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী রয়েছে। হাম্বলী মাযহাবের অল্পসংখ্যক অনুসারী রয়েছে; এক সময় দামেস্ক ও বাগদাদে তারা অধিক সংখ্যায় ছিল।

ইসলামি শরীয়তের মূল উৎসগুলো চারটি অংশ নিয়ে গঠিত : কুরআনুল কারিম, হাদিস শরিফ, ইমামগণের ইজমা এবং ফকিহগণের কিয়াস।

যখন মুজতাহিদগণ একটি নির্দিষ্ট বিধান কিভাবে সম্পাদন করা যায় তা স্পষ্টভাবে কুরআনুল কারিমে পেতো না, তখন তারা হাদিস শরিফের সহায়তা নিতো। যদি তারা হাদিস শরিফেও এটি পরিষ্কারভাবে খুঁজে না পেতো, তবে যদি ইজমার[১২] ভিত্তিতে এটি করা যায় তাহলে তারা ঘোষণা করতো যে এ বিধানটি এভাবে মেনে চলতে হবে।

ইজমার মাধ্যমেও যদি কোনো নির্দিষ্ট বিধিমালা উদ্ভাবন করা না যেতো, তবে তা মুজতাহিদগণের কিয়াসের ভিত্তিতে আমল করতে হতো। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, এ চারটি দলীল ছাড়াও তৎকালীন সময়ে মদিনায়ে মুনাওয়ারার বসবাসকারী লোকদের সর্বসম্মতি (ঐকমত্য)ও দলীল হিসেবে গৃহীত হতো। তিনি আরো বলেন, "এই প্রথা (ঐকমত্য) ঐতিহ্যগতভাবে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তরিত হচ্ছে যেমন তাদের পিতা, তার পিতামহ, এভাবে মূলত রসুল (দ.) এর থেকে হস্তান্তরিত হচ্ছে এসেছিল। "তিনি এটাও বলেন, যে, এ দলীলটি কিয়াসের চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য ছিল; কিন্তু অন্য তিন মাযহাবের ইমামগণ মদিনার বাসিন্দাদের কোন উল্লেখযোগ্য দলীল হিসেবে বিবেচনা করতেন না।

ইজতিহাদের জন্য দুটি পদ্ধতি ছিল। একটি ছিল ইরাকের উলামাদের পদ্ধতি যাকে রায় (পছন্দ)ও বলা যায় বা কিয়াসের (তুলনা) পদ্ধতি। যদি কুরআনুল কারিমে অথবা হাদিস শরিফে সুস্পষ্টভাবে কীভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিধান পালন করা হবে তা ঘোষণা করা না হয়, তবে যেভাবে অন্য একটি বিধিমালা যা কুরআনুল কারিমে অথবা হাদিস শরিফে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছিল এবং যা আরোপিত বিধিমালার (মাসয়ালা অর্থে) অনুরূপ ছিল সেটির অনুসন্ধান করা হতো।

---

[১১]. তবুও, কারো নিজ মাযহাব অনুসরণে খারাজের ক্ষেত্রে (অসুবিধা সৃষ্টি হলে) কিছু শর্তানুসারে সে বিষয়ে অন্য একটি মাযহাব অনুসরণ করা জায়েজ (অনুমোদনযোগ্য)। বিকল্প সুবিধাটি ব্যবহার করার সময় তাকে অবশ্যই পরের মাযহাবের শর্তগুলো গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। ইবনে আবেদিনে নিকাহে রাজেয়ী নামক অধ্যায়টিতে লেখা আছে যে এরূপ পরিস্থিতিতে মালেকী মাযহাবকে অনুসরণ করার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ একটি ফতোয়া জারি করেছেন।

[১২]. ইজমা অর্থ সর্বসম্মতি, ঐকমত্য; সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন বা একই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট বিধান পালন করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের স্থলাভিষিক্ত হওয়া তাবেঈনদের ইজমাও দলীল ছিলো। তাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া লোকেরা কী করেছে বা বলেছে তা ইজমা নয়, বিশেষত তারা যদি বর্তমানের লোক বা ধর্ম সংস্কারক অথবা ধর্মীহয়ভাবে অজ্ঞ মানুষ হয়।

যখন তা পাওয়া যেতো, তখন মাসয়ালাটিকে উত্থাপিত মাসয়ালার সাথে তুলনা করা হতো এবং একইভাবে মাসয়ালাটি সম্পাদন করা হতো। সাহাবায়ে কেরামের পর, এ শ্রেনীর মুজতাহিদদের প্রধান ছিলেন ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)।
দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল হেজাজের উলামা'দের পদ্ধতি, যাকে বলা হতো রিওয়া (ঐতিহ্য)। তারা মদিনায়ে মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের প্রথাকে কিয়াসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করতো। এ প্রকার মুজতাহিদগণের মধ্যে সর্বশ্রে ছিলেন ইমাম মালেক (রহ.), যিনি মদিনায়ে মুনাওয়ারাতে বসবাস করতেন। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর (মালেক) সাহচর্যে এসেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের সাহচর্যে এ পদ্ধতিটি আয়ত্ত্ব করে বাগদাদ চলে যান, তথায় ইমাম আজম আবু হানিফার শিষ্যদের কাছ থেকে তাঁর পদ্ধতিটিও শিখে নেন এবং এ দুটি পদ্ধতীকে একীভূত করেন)। ফলে তিনি একটি নতুন ইজতিহাদ পদ্ধতি প্রতি করতে সক্ষম হন। অত্যন্ত বাকপটু ও সাহিত্যিক হওয়ার কারণে তিনি আয়াত এবং হাদিসের অনুষঙ্গটি বুঝতে পারতেন এবং তাঁর পাওয়া সুস্পষ্ট বিকল্প সমাধান অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। যখন তিনি স্পষ্ট বিকল্প কোন পদ্ধতি খুঁজে না পেতেন, তখন তিনি নিজেই কিয়াসের পদ্ধতি অনুযায়ী ইজতিহাদে নিয়োজিত হতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও ইমাম মালেক (রহ.) এর ইজতিহাদ পদ্ধতি শেখার পর বাগদাদে গিয়ে ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) এর শিষ্যদের কাছ থেকে কিয়াস এর ইজতিহাদ পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করেন। তবুও, যেহেতু তিনি অনেকগুলো হাদিস মুখস্থ করেছিলেন। তাই তিনি প্রথমেই একটি হাদিস অন্য হাদিসের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা নির্ণয় করা নিয়ে ইজতেহাদ করেছিলেন। সুতরাং তিনি আহকামে ইসলামিয়্যা সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে অন্য তিন মাযহাবের সাথে একমত নন।
এই চার মাযহাবের বিষয়টি একটি বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ : তা হলো–যখন কোন একটি গোষ্ঠী কিংবা শহরের বাসিন্দার সৃষ্ট নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়, যখন শহরের প্রধান ব্যক্তিরা আইনগ্রন্থে তার সমাধান খুঁজে পায় না, তখন তারা একত্রিত হয় এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সংগতিপূর্ণ আইন এর সাহায্যে এর সমাধান বের করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও তারা পারস্পরিক চুক্তিতে আসতে পারে না। তাদের মধ্যকার কিছু লোক বলে, রাজ্যের উদ্দেশ্য হলো দেশের লোকেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শহরগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা। তখন তারা যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যা ও আইনের অনুছেদে স্পষ্টরূপে বর্ণিত তদ্রুপ কোনো সমস্যার সাদৃশ্যতা বের করার মাধ্যমে উল্লেখিত সমস্যার সমাধান করে। এ পদ্ধতিটি হানাফি মাযহাবের মতো। এক্ষেত্রে অন্যরা রাষ্ট্র হতে ঘোষিত কর্মকর্তাদের আচরণ ও কার্যক্রম অনুকরণ করেন এ ভেবে যে আমাদের কাজটিই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এ পদ্ধতিটি মালেকী মাযহাবের মতো। অন্য কেউ কেউ কোন বিধিমালা উদ্ভাবনের উপায় হিসেবে আইনের প্রকাশ এবং প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করাকে উত্তম মনে করেন। এ পদ্ধতিটি শাফেয়ী মাযহাবের মতো। তাছাড়া অনেকে আইনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ একত্রিত করে সেগুলোর একটির সাথে অন্যটিকে তুলনার মাধ্যমে কোন একটি সমাধানে আসাকে শ্রেয় মনে করেন। আর এটি হলো হাম্বলী মাযহাবের অনুরূপ। এভাবেই, শহরের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি একটি সমাধান খুঁজে বের করে এবং বলে যে তার সমাধানটি সঠিক এবং আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইন যা অনুমোদন করে তা হলো চারটির মধ্যে একটি সঠিক এবং অন্য তিনটে ভুল। আইনের সাথে তাদের মতবিরোধ আইনের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তারা চেষ্টা চালিয়ে যায় রাজ্যের আদেশ মান্য করতে। সুতরাং, তাদের কোনটিই দোষী হিসেবে বিবেচ্য নয়। বরং তারা কঠোর প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসিত হতে পারে। কিন্তু যদি যারা সঠিক সিদ্ধান্তটি আবিষ্কার করে তারা বেশি প্রশংসিত হবে এবং পুরস্কৃত হবে। চার মাযহাবের বিষয়টিও এ ধরনের। যেভাবে আল্লাহ তা'য়ালা চেয়েছেন তা চার মাযহাবের মধ্যে যেকোন একটিই হবে। একটি নির্দিষ্ট মাসয়ালা, যে ব্যাপারে চার মাযহাব একে অপরের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে, সেগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি সঠিক হবে এবং অন্য তিনটি ভুল। তবে, যেহেতু প্রতিটি মাযহাবের ইমাম সঠিক পথটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের মধ্যকার যারা ভুল ছিলেন তাদের ক্ষমা করা হবে। এমনকি তাদের পুরস্কৃতও করা হবে, কারণ নবীয়ে আকরাম (দ.) বলেন, গবেষণায় ভুল বা ভুলে যাওয়ার কারণে আমার উম্মতের জন্য কোন গুনাহ নেই। তাদের মধ্যে এ পার্থক্যগুলো শুধুমাত্র কিছু তুচ্ছ বিষয় সম্পর্কিত। যেহেতু বিশ্বাস ও অধিকাংশ ইবাদাত সম্পর্কিত কার্যাবলি অর্থাৎ এমন বিষয় যা কুরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একাত্মতা ছিল, তাই তাঁরা একে অন্যের সমালোচনা করতেন না।
প্রশ্ন : ওহাবিয়ত, ইংরেজদের কর্তৃক প্রতিতি একটি বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের বই পড়া লোকেরা বলে : মাযহাব গুলো হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্থিত হয়েছিল। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনরা কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?
উত্তর : মাযহাবের ইমাম হচ্ছেন একজন মহান পণ্ডিত (আলেম), যিনি সাহাবায়ে কেরাম হতে এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফে স্পষ্টভাবে বর্ণিত বিষয়ের ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করে তা বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেসব মাসয়ালা স্পষ্টভাবে

বর্ণনা করা হয়নি, সেসবের ক্ষেত্রে তিনি (মাযহাবের ইমাম) সেগুলোকে স্পষ্টভাবে ঘোষিত বিষয়াদির সাথে তুলনামূলক গবেষণা করতেন। প্রসিদ্ধ চারজন ইমামের যুগেও তাদের পাশাপাশি সেখানে অন্যান্য অনেক ইমাম ছিল যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মাযহাব ছিল। তবে শতাব্দীর পরিক্রমায় ক্রমান্বয়ে তাদের অনুসারীদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তাদের কেউই নেই।"[১৩] প্রত্যেক সাহাবীই ছিলেন মুজতাহিদ, একেকজন গভীর জ্ঞানের পণ্ডিত এবং মাযহাবের ইমাম। প্রত্যেকের নিজস্ব মাযহাব ছিলো এবং চার মাযহাবের ইমামদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং যেকোন বিষয়ে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাদের মাযহাবগুলো আরও সঠিক এবং শ্রেয় হতে পারতো। কিন্তু যেহেতু তারা বই লিখেননি, তাদের মাযহাবগুলো বিস্মৃত হয়ে গেল। তাই অচিরেই এ চারটি মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনও মাযহাবের অনুসরণ করা আর সম্ভব হয়নি। "সাহাবাগণ কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?" এ কথাটি "কর্নেল কোন সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত" বা "স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক কোন ক্লাসের অন্তর্গত" কথাগুলোর মতোই)?]

অনেক বইয়ে লেখা আছে যে, হিজরতের চারশো বছর পরে মুতলাক (প্রকৃত) ইজতেহাদ করতে সক্ষম তেমন কোন আলেম ছিলেন না। আল-হাদিক্বা গ্রন্থের ৩১৮ নং পৃার হাদিস শরিফে বলা হচ্ছে, ধর্মীয় বিষয়ে ভ্রান্ত ও মতবিরোধী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এ কারণে, প্রতিটি সুন্নী মুসলমানকেই বর্তমানে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের যেকোনো একটিকে (তাকলিদ) অনুসরণ করতে হবে। এটাই যে, তাদের চার মাযহাবের যে কোন একটির (ইলম আল-হাল) বইগুলো অধ্যয়ন করতে হবে, সেসবে বিশ্বাস করতে হবে এবং বই অনুসারে তাদের মাযহাবের ইমামগণের প্রণিত মাসয়ালাগুলো গ্রহণ ও পালন করতে হবে।

এভাবে তারা মাযহাবগুলোর কোনো একটির সদস্য হিসেবে পরিণত হবে। আর যারা এর একটিও অনুসরণ করেনা, তারা সুন্নী হতে পারে না, তবে একজন লা-মাযহাবী ব্যক্তি হতে পারে, যে মতবিরোধপূর্ণ বাহাত্তরটি দলের যেকোনো একটির হতে পারে অথবা একজন অমুসলিম।[১৪]

মিযানুল কুবরা নামক কিতাবের লেখক (রহ.) এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন : "সমস্ত ভুলে যাওয়া মাযহাব ও বর্তমানে বিদ্যমান চারটি মাযহাব সহীহ এবং বৈধ। এদের কোনটিই অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। কারণ তারা সবগুলোই ইসলামের একই ভিত্তির উপর প্রতিতি। প্রতিটি মাযহাবের মধ্যে সহজ (রুখসাত) কাজগুলোর (বিধিমালা) পাশাপাশি কঠিন (আজিমাত) কাজেরও বিধান রয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি আজিমা তথা কঠিন কাজ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তা না করে পরিবর্তে রুখসা তথা সহজ কাজ করার চেষ্টা করে, সে যেন ইসলামের বিধিমালার সাথে খেলা (ব্যঙ্গার্থে) তৈরি করলো। তবে যার কোনো ওজর রয়েছে [কঠিন (আজিমাত) করতে অক্ষম], সেক্ষেত্রে সে সহজ (রুখসাত) বিধানগুলো পালন করতে পারবে। সে রুখসা আদায় করলেও আজিমা আদায় করার সমান সওয়াব পাবে। একজন সক্ষম ব্যক্তির জন্য নিজের মাযহাব অনুযায়ী সহজ বিধিমালা পালনের পরিবর্তে কঠিন বিধিমালাগুলো পালন করা ওয়াজিব। তাছাড়া, কোন একটি বিধান কেবল নিজের মাযহাবে সহজ থাকলেও অন্য মাযহাবে যদি কঠিন হিসেবে থাকে, এমতাবস্থায় পরেরটি করা তার জন্য ওয়াজিব হবে। প্রত্যেকের উচিত যে আইয়িম্যায়ে মাযহাবের কারো কথা অপছন্দ করা কিংবা নিজের মতকে শ্রেকরণের চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। অন্যদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মুজতাহিদগণের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে কিছুই না।[১৫] যেহেতু কোন ওজর ব্যতীত[১৬] কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজ মাযহাবের রুখসা (সহজ) কাজ করা অনুমোদিত নয়, সুতরাং, এটা বোঝা যায় যে এটি কখনও অন্য মাযহাবেও অনুসন্ধান করা জায়েয নেই, যাকে মাযহাবের মধ্যে তালফিক (মিশ্রণ) বলা হয়।

দুররুল-মুখতার বইয়ের লেখক (আলাউদ্দিন হাসকাফী (রহ.), হিজরি ১০২১-১০৮৮ [১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ], দামেস্ক,) তার বইয়ের ভূমিকায় এবং সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইমান বিন উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) কর্তৃক লিখিত এর টীকাগ্রন্থ রদ্দ-উল-মুহতার যেটি ইবনে আবেদিন শিরোনামেও পরিচিত, এ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে : মাযহাবে রুখসাত তথা সহজ কাজ অনুসন্ধান করা ঠিক নয় এবং অন্য মাযহাব অনুসরণ করে ইবাদত করা অনুচিত (অর্থাৎ, চারটি মাযহাবের মিশ্রণ তৈরি করে কোন কাজ করাও সহীহ নয়।) উদাহরণস্বরূপ, শাফেয়ীর মতে যদি কোন ব্যক্তির ত্বক হতে রক্তপাত হয় তাহলে তার অযু

---

[১৩]. আল-হাদিকা, পৃা-৩১৮

[১৪]. এই ঘটনাটি বাহার, হিন্দিয়া, আত- তাহবিয়া কিতাবের "জাবায়িহ" অধ্যায়ে এবং রদ্দ-উল-মুহতার কিতাবের "বাগিচ" অধ্যায়ে লেখা রয়েছে। তাছাড়া, আল-বাসায়ির নামক গ্রন্থের ৫২ পৃায় লেখা আছে, আহমদ সাওয়ি এর তাফসীরে বর্ণনা আছে, অনুরূপ সুরা আল-কাহাফে লেখা আছে।

[১৫]. আল-মিজান আল-কুবরা, ভূমিকা।

[১৬]. ওজর' একটি পরিভাষাগত শব্দ, যা তুর্কি সংস্করণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভাঙবে না কিন্তু হানাফির মতে, যখন রক্তপাত হয় তখন অযু ভেঙ্গে যায়। অন্যদিকে, যদি কোন নন-মাহরাম মহিলা তার ত্বক স্পর্শ করে শাফেয়ীদের মতে ব্যক্তিটির অযু ভেঙে যাবে অনুরূপভাবে হানাফি মাযহাব অনুসারেও ভেঙ্গে যাবে।[১৭] অতএব, যদি কোনো ব্যক্তির ত্বকে রক্তপাত হয় এবং কোনো নন-মাহরাম মহিলার ত্বক স্পর্শ করার পর সেই ওযু দ্বারা আদায়কৃত সালাত সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে, মাযহাবের ইমাম ও ইসলামি পণ্ডিতগণের ঐক্যমত্যে এরূপ করা অবৈধ তথা বাতিল যখন অন্য কোন মাযহাবের কোন কিছু করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি শাফেয়ীদের কোন ব্যক্তি যদি কোন কুকুরকে স্পর্শ করে তবে তার মাযহাব অনুযায়ী তার ভেজা হাতটি হালকাভাবে তার নিজের মাথার ছোট্ট লোমাংশে একটি ছোট্ট অঞ্চলে ঘষে নিয়ে অযু করে সালাত আদায় করে [যদি না কুকুরকে স্পর্শকৃত অংশটি ধুয়ে না নেয়] তাহলে তাঁর সালাত সহীহ হবে না যা মালেকী মাযহাবেও উল্লেখ আছে। শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে কুকুর দ্বারা স্পর্শকৃত ব্যক্তির সালাত ছহীহ হবেনা। যাহোক, মালেকী মাযহাবের মতে, একটি কুকুর ধর্মীয়ভাবে অপবিত্র নয় (নাজস), তবে মালেকী মাযহাবের একজন ব্যক্তিকে অযু করার সময় তার নিজের মাথার পুরো লোমশ অংশে ভেজা হাত ঘষে নিতে হবে। একইভাবে, তালাক (ডিভোর্স) স্থায়ীভাবে দেওয়া হানাফি মাযহাবের মধ্যে সহীহ, তবে অন্য তিন মাযহাবে এটি সহীহ নয়। সুতরাং, এটি কোন লোকের জন্য শরীয়তকর্তৃক হানাফি মাযহাব অনুসারে তালাক দিয়ে একই সময়ে শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে তালাককৃত মহিলা কিংবা তার বোনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাকে পূর্বে বিবাহবিচ্ছেদ করেছিলেন তা জায়েয কিংবা বৈধ নয়।[১৮] ইসলামি শরীয়তের পণ্ডিতদের সর্বসম্মতিক্রমে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে তালফাক তৈরি করা অর্থাৎ মাযহাবের রুকসা (সহজ) গুলো অনুসন্ধান করা এবং সে অনুসারে কাজ করা সহীহ নয় বরং তা মনগড়া কিংবা সারগ্রাহী চিন্তাধারা ছাড়া কিছু না। চার মাযহাবের যেকোন একটিকে অনুসরণ করা ব্যতীত কোন কিছু করা শরীয়তকর্তৃক অনুমোদিত নয়।[১৯] তাছাড়া, শাফী মাযহাবে ফজর এবং দুপুরের সালাত একসাথে আদায় এবং সন্ধ্যা ও রাতের সালাত অজুহাত থাকা শর্তে একসাথে আদায়ের অনুমতি রয়েছে। উজর (অজুহাত) যেমন সফর (যা দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করা হয়) আর মাতর (বৃষ্টি) (যাকে ভারী বৃষ্টি বলা যায়)। এটি হানাফি মাযহাবে জায়েয নেই। যদি হানাফি মাযহাবে কেউ যখন ভ্রমণ করছেন, তখন দুপুরের সালাত বিকেলে পড়া হারাম যদি না কোন চাপগৃষ্টি কিংবা অসুবিধা হয়। তাছাড়া বিকেলের সালাত দুপুরের সাথে আদায় করাও কোন ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে না। তবে উভয় ক্ষেত্রেই শাফেয়ী মাযহাবে সহিহ হয়। যখন কোন কাজ সম্পাদনে একটি বড় অসুবিধা (হরজ, মুশকিল) সৃষ্টি হয় নিজ মাযহাব অনুসারে এক্ষেত্রে সহজ পন্থানুসরণের অনুমতি রয়েছে। তাছাড়া কোন সহজ কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও যদি কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই বিশেষ ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবের অনুসরণ শরীয়তকর্তৃক অনুমিত। কিন্তু তখন তার অনুসৃত দ্বিতীয় মাযহাবের ফরয ও ওয়াজিব কাজগুলো তাকে পালন করতে হবে।[২০]এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যেব্যক্তি যিনি অন্য মাযহাবের অনুকরণ করছেন তিনি তার নিজের পূর্বের মাযহাব হতে বের হচ্ছে যান নি এবং তার পূর্বের মাযহাব পরিবর্তন করতে হবে না। কেবলমাত্র, তার পালনীয় কাজগুলোর ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবের নীতিগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ইবনে আবেদীন (রহ.) রদ্দ-উল-মুহতার কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের পাঁচশত বিয়াল্লিশ পৃায় উল্লেখ করে বলেন যে, যদি কোন হানাফি অযু করার সময় নিয়ত/ইছা/ সংকল্প না করে যে, এ অযু দ্বারা যুহরের সালাত আদায় করবে এমতাবস্থায় যদি সে পূর্বের অযু দ্বারা যুহরের সালাত আদায় করে ফেলে সেক্ষেত্রে সহিহ হবে। কিন্তু শাফেয়ীদের ক্ষেত্রে যদি সে দেরীতে সালাতের সময় আসার পরে সেই অযু দ্বারা দুপুরের সালাত এবং সেই অযু দ্বারা আছরের সালাত আদায় করে এটি সহীহ হবে না। বরং, আনুানিকভাবে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে তাকে পুনরায় অযু করতে হবে।[২১] যদি কোন ব্যক্তি ধর্মীয় প্রয়োজন কিংবা বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই তার মাযহাবকে শুধু পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করে সে ইসলামকে একটি খেলায় পরিণত করলো। বরং, তার জন্য সে দণ্ডিত হবে এবং তিনি ইমান নিয়ে মারা যায় কিনা তাতে আশংকা থেকে যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন যে, যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। এ কারণে, একজন মুজতাহিদকে জিজ্ঞাসা করা ওয়াজিব অর্থাৎ একটি মাযহাবকে অনুসরণ করতে হবে। একটি মাযহাব অনুসরণ করার ফলে অন্য আরেকজন সহজে অনুমান করতে পারে সে কোন মাযহাবের অনুসারী। একটি মাযহাবকে অনুসরণ করার অর্থ হলো সেই মাযহাবকে পড়া, শেখা এবং মাযহাবের ইমামগণের শিক্ষা

---

[১৭]. অনুগ্রহ করে (Endless Bliss) কিতাবের পঞ্চম ফ্যাসিকালের (পরিচ্ছদ) দ্বাদশ অধ্যায়ের বাকী অর্ধেক অংশটি স্ক্যান করুন।

[১৮]. তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত দেখার জন্য দয়া করে Endless Bliss বইয়ের ষ পরিচ্ছদের পঞ্চদশ অধ্যায়টি দেখুন।

[১৯]. দুর্রুল-মুখতার এর উপস্থাপনা এবং রদ্দ- আল-মুহতির এটিকে টীকায়িত করে।

[২০]. ইবিড, সালাতের সময় বিভাগ।

[২১]. রদ্দ-আল-মুহতার, ২য় খণ্ড ,৫৪২ পৃা।

অনুযায়ী কাজ করা। কেউ কোন মাযহাবকে জানা এবং শেখা ব্যতীত আমি শাফেয়ী কিংবা হানাফি এরূপ বলে কোন মাযহাবে যোগদান করতে পারবে না। এ জাতীয় লোকদেরকে কিভাবে ধর্মীয় উপাসনা করতে হবে সে সম্পর্কে ধর্মীয় পণ্ডিত ও ইলম আল হাল বইয়ের পরামর্শ নিতে হবে।[২২] "যে ব্যক্তি নিজের মাযহাবকে তুচ্ছ করে এবং সহজ কাজগুলো চয়ন করতে নিজ মাযহাব পরিবর্তন করে [অর্থাৎ যিনি মাযহাবকে এক করে এবং তাদের নির্বাচনে সহজ তথা রখসা অনুসন্ধান করে] তাদের কাজগুলো সাক্ষী হিসেবে গৃহীত হবে না।[২৩]

ইবনে আবেদীন তাঁর প্রবন্ধে লেখেন যে, খলিফা হারুনুর রশীদ ইমাম মালেককে বলেন, যে, "আমি তোমার বইগুলো বিশ্বের সব মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই এবং প্রত্যেককে কেবল এগুলো অনুসরণ করার আদেশ দিতে চাই। ইমাম মালেক জবাব দিলেন যে, হে খলিফা! এটা করবেন না, জ্ঞানীদের মাযহাবগুলোর সাথে পৃথক হওয়া হল আল্লাহ তা'য়ালার তার উম্মতগণের উপর করুণা। প্রত্যেকে তার পছন্দ মতো মাযহাব অনুসরণ করবে। সব মাযহাব সঠিক। একজন মু'মিন' বা মুসলিম' বা মুসলমান' এমন একজন যে আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর ইসলামিক শিক্ষাগুলো গ্রহণ এবং বিশ্বাস করে যা মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। এ শিক্ষাগুলো কুরআনুল কারিমে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কয়েক হাজার হাদিসে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামগণ এসব রসুল (দ.) এর কাছ থেকে শুনেছিল। সালাফে সালেহীন অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তীতে আসা ইসলামি পণ্ডিতগণ তারা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে তাদের বইগুলোতে সেগুলো লিখেছেন যে হাদিসগুলো সরাসরি বা অন্য পণ্ডিতদের দ্বারা শুনেছেন যারা সরাসরি সাহাবায়ে কেরামগণ হতে শুনেছেন। যেসব ইসলামি পণ্ডিতরা সফল হয়েছিল তারা তাদের ব্যাখ্যার দিক হতে একে অপরের থেকে পৃথক যা সালফে সালেহীন হতে বর্ণিত। এভাবে, বাহাত্তরটি মূলধারার মতবাদ সংক্রান্ত পৃথক পৃথক গোী সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু তারা এ গ্রুপগুলোর মধ্যে একটিও অনুসরণ করে নি। কিন্তু তাদের মধ্য হতে শুধু একটি মাত্র সম্প্রদায় যারা নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা এবং মতামতে ওই বাহাত্তর সম্প্রদায়ের কোন কিছুই তাদের মধ্যে কিছুতে পরিবর্তন বা যুক্ত করে নি। আর সেই সঠিক গোীকে আহলে সুন্নাহ বা সুন্নী বলা হয়। বাকী বাহাত্তর গ্রুপ যারা ভুল ব্যাখ্যা এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহ ও হাদিসের ব্যাখ্যার কারণে পথচ্যুত হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে তাদের বিদাআতি (দালালা, বিচ্যুতি, ধর্মবিরোধী) বা লা-মাযহাবী বলা হয়। যদিও তারা মুসলমান তবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস রয়ে গেছে।

কিছু লোক সালফে সালেহীন এর বইগুলো হতে জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা এবং হাদিস শরিফের ব্যাখ্যায় কেবল তাদের নিজস্ব এ এবং মতামত চাপিয়ে দিতে চায়, এইভাবে তাদের গোী পুরোপুরি বিচ্যুত হয় এবং তারা অবিশ্বাসীতে পরিণত হয় যাদেরকে মুলহিদ ডাকা হয়।

মুলহিদ নিজেকে সচেতন মুসলিম এবং হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর উম্মত মনে করে। মুনাফিক এমন ভান করে, যেন সে মুসলিম; কিন্তু সে অন্য ধর্মের সাথেও সম্পর্ক রাখে। একজন জিন্দিক হচ্ছে নাস্তিক যারা কোন ধর্ম বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা মুসলমানদের অধার্মিক মুসলিম ও নাস্তিক তৈরি করার জন্য মুসলমান হওয়ার ভান করে। সে ইসলামে সংস্কারের মাধ্যমে এটি পরিবর্তন এবং অমান্য করে ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। সে ইসলামের শত্রু। এরূপ কিছু অপ্রতুল মানুষের উদাহরণ হচ্ছে ফ্রিমাস মুক্তমনা এবং ইংরেজি গুপ্তচর।[২৪]

মুসলিম হওয়ার জন্য শুধু ইমানের ছয়টি মূলভিত্তি বা মতবাদে বিশ্বাস করা যথেষ্ট নয় সাথে সাথে ইসলাম যা ফরয করেছে তা পালন এবং যা নিষেধ তথা হারাম ঘোষণা করা হচ্ছে তা হতে বিরতও থাকতে হবে। আর যেব্যক্তি এ সত্য তথা ফরযকে পালন করা এবং হারাম হতে বিরত থাকাকে অস্বীকার করে সে তার এ কর্মের জন্য বিশ্বাস হারাবে এবং মুরতাদ (পুনর্জন্ম, ধর্মত্যাগ, ধর্মত্যাগী) হচ্ছে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি যিনি এটি বিশ্বাস করেন কিন্তু এক বা একাধিক ফরয আদায় করে না বা একাধিক হারাম কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তিনি মুসলিম থাকবেন কিন্তু একজন অপরাধী, পাপী মুসলমান হিসেবেই গণ্য হবেন। এরূপ মুসলমানকে ফাসেক বলা হয়। ফরয আদায় এবং হারাম হতে বিরত থাকাকে ইবাদত পালন বলা হয়। একজন মুসলিম যিনি ইবাদত পালনে সচেষ্ট এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন তাকে সালিহ বলা হয়। বর্তমানে এ বিশাল ও প্রশস্ত বিশ্বের একজন মুসলিম হিসেবে এটি দাবি করা উচিত হবে না যে, সে ইমানের ছয়টি মূলভিত্তি এবং ফরয ও হারাম বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত নয়। সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা একটা গুরুতর পাপ। এসব

---

[২২]. রদ্দ-উল-মুহতার, তা'জিরের অধ্যায়।

[২৩]. ibid, সাক্ষীর অংশ।

[২৪]. "Confessions of a British Spy" শিরোনামে বইটি দেখুন,যা হাকিকত কিতাবেবী প্রকাশনার তুরস্কের,ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত।

তাদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্তভাবে শিখতে হবে এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে। যদি কারো গুরুত্বহীনতার কারণে এসব শিখতে তারা অবহেলিত হয়, ফলাফল হিসেবে তারা কাফির অবিশ্বাসী হচ্ছে যাবে। যদি কোনো অ-মুসলিম যিনি কেবলমাত্র বললেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ এটির অর্থ জানলেন এবং বিশ্বাস করলেন এবং অবিলম্বে মুসলমান হচ্ছে যাবেন। তবে, পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে তিনি ইমানের ছয়টি ভিত্তি এবং ফরয ও হারাম কাজগুলো সম্পর্কে যারা জানে এমন মুসলিম হতে শিখে নিবেন এবং মুসলমানদেরও উচিত তাকে সেগুলো শিক্ষা দেয়া। যদি সে সেগুলো না শিখে তবে সে ইসলামের বাইরে চলে যাবে এবং মুরতাদ হচ্ছে যাবে। আহলে সুন্নাতের পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত (ইলম-আল-হাল) বইটি থেকে তাদের শেখা প্রয়োজন। (সুন্নীদের বিরুদ্ধচারণ করে এমন কোন লেখকের কথা বা শিক্ষা তার বিশ্বাস করা উচিত হবে না)

বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক দলের বিবিধ তথ্য

মুসলমানদের মধ্যে দুটি প্রধান দল রয়েছে। তাদের একদল হলো আহলে-সুন্নাত। এ প্রধান গোীর মুসলমানরা কেবল সঠিক এবং নির্ভুল দল যেটি আহলে সুন্নাহর মাযহাব নামে পরিচিত। এটি আবার চারটি ভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত। মুসলমানদের এ চারটি মাযহাবের বিশ্বাস ও ইমানের ভিত্তি একই। ইসলামে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের সবাই আহলে-সুন্নাহর উপর বিশ্বাস রাখে। দ্বিতীয় প্রধান গোষ্ঠীটি হলো এমন ব্যক্তিদের যারা সুন্নী গ্রুপের মতো একই বিশ্বাস ও ইমানের ধারক নয় যাদেরকে বিদ‘আতী তথা লা-মাযহাবী বলা হয়। এ বিপর্যয়কর গ্রুপের উদাহরণ হলো শিয়া এবং ওহাবী। যারা ইবনে তায়েমিয়া ও জামালুদ্দীন আফগানী এবং মুহাম্মদ আব্দুহ ও সাঈয়েদ কুতুব মওদুদী এবং যেসব লোকেরা নিজেদেরকে তাবলীগ-ই জামাত, ওহাবী (যারা আহলে বিদ‘আত নামে অভিহিত) নামে অভিহিত করে। ওহাবীরা তাদের নিজেদেরকে পঞ্চম মাযহাবের সদস্য হিসেবে দাবী করে। কিন্তু তাদের এ দাবি সত্য নয়। পঞ্চম মাযহাব বলে কোন জিনিস নেই। বর্তমানে তাদের এ চার মাযহাবের কোন একটি সম্পর্কে [ইলম-আল-হাল] বইটি থেকে ইসলামি জ্ঞান শেখা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। প্রত্যেকেই তাদের ইছা অনুযায়ী সহজবোধ্য তাদের অনুসরণীয় তাদের মাযহাবটি বেছে নিতে পারবে। তাদের তার বইটি পড়তে এবং শিখতে হবে। তারা এটির সঙ্গে সহনীয় আরো কিছু করে তা অনুসরণ করতে হবে এবং তাকলীদ এর একজন সদস্য হচ্ছে যেতে পারবে। কারণ এটি কোনো ব্যক্তি তার বাবার নিকট হতে শ্রবণ এবং দেখে শেখা তার জন্য সহজ। একজন মুসলিম সাধারণত তার পিতামাতার মাযহাব এর অন্তর্গত। এখানে চারটি মাযহাব হচ্ছে মুসলমানদের জন্য একটি সুবিধা। কেউ একটি মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাব চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, এবং অন্যের সাথে যোগ দিতে পারে, তবে এটি নতুন এবং তা অধ্যয়ন ও শিখতে বছর খানেক সময় লাগবে। (তাছাড়া কিছু প্রাক্তন শেখা, ব্যবহার নাও থাকতে পারে এবং অনেক কিছু করার সময় বিভ্রান্তিও হতে পারে)। কোন একটি মাযহাব ছেড়ে যাওয়ার কোন প্রকার অনুমতি নেই, কারণ ইসলামি পণ্ডিতের মতে, তারা পূর্বের মাযহাবেরকে অপছন্দ করেছে যা সালেফে সালেহীনদের অপছন্দ করা ও তাদেরকে মূর্খ মনে করার ন্যায় কাজ। সম্প্রতি পাকিস্তানে মওদুদী এবং মিশরের সাঈয়েদ কুতুব ও হারুনুর রশীদ রিডার মতো কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা এবং তাদের পথভ্রষ্ট পাঠকরা বলে যে চারটি মাযহাবের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং চারটি মাযহাবের রুখসা তথা সহজ কার্যাবলী নির্বাচন ও সমাবেশ করে সহজে সম্পাদনযোগ্য করা উচিত। তারা তাদের ছোট মন-মানসিকতা এবং অপ্রচলিত জ্ঞানে এ ধারণা পোষণ করে। তাদের বইগুলো একবার নজর দিলে দেখা যাবে যে, তারা তাফসীর, হাদিস, উসূল অথবা ফিকাহের কোন জ্ঞান তাদের কাছে নেই বরং তারা তাদের অজ্ঞতার যুক্তি এবং মিথ্যা লেখার মাধ্যমে তাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ করে। নিম্নলিখিত উক্তিগুলো বিবেচনা করুন :

১. চারটি মাযহাবের পণ্ডিতরা বলেন, মুলফিকের তথা কৃত্রিমতার সিদ্ধান্তটি ভুল অর্থাৎ একই সময়ে এক বা একাধিক মাযহাবকে অনুসরণ করা বাতিল (অবৈধ) হবে তথা সহীহ নয়। তখন এ কাজ কোন মাযহাবদের ক্ষেত্রে সহীহ না। যেব্যক্তি চারটি মাযহাবের ইমাম (রহ.) গণের ঐকমত্যকে সম্মান না করে অর্থাৎ অনুসরণ না করে তবে সে কোন মাযহাবের মধ্যে নেই। সে একজন লা-মাযহাবী হচ্ছে যাবে। এ লা-মাযহাবীর সমস্ত কার্যক্রম ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না বরং সবগুলোই মূল্যহীন হবে। সে ইসলামের সাথে যেন একটি খেলা তৈরি করলো।

২. মুসলমান এবং তাদের ইবাদত একটি একক উপায়ে ইসলামে আরও কঠিন হতে পারতো। মহান আল্লাহ এবং তার নবী (দ.) সবকিছু যদি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করতেন কিন্তু তারা এটি করতেও পারতেন এবং যদি করতেন তাহলে ঘোষিত সবকিছু একটি নির্দিষ্ট উপায়ে করতে হতো। কিন্তু মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ করে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রসুল (দ.) সবকিছু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেননি। আহলে-সুন্নাতের পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানের ফলে বিভিন্ন মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে। যখন কোন ব্যক্তি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তিনি নিজ মাযহাবে একটি সহজ উপায় অনুসন্ধান করে। বৃহত্তর অসুবিধার ক্ষেত্রে, তিনি অন্য মাযহাব অনুসরণ করে এটি সহজেই করতে পারে। সেখানে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হবে না কারণ তিনি একটি মাযহাবেই রয়েছে; কিন্তু লা-মাযহাবীদের যারা মনে করে যে, তারা রুখসাত (সহজ) উপায়ে করার জন্য এটি একটি পদ্ধতি, যা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য কষ্টের উদ্ভব হতেই এটা করা। সম্ভবত তারা (লা-মাযহাবী) অসচেতনতার জন্য এটা করছে।

৩. একটি মাযহাবের কিছু অংশ পালনের সাথে অন্য মাযহাবের কিছু অংশ পালন করার প্রচেষ্টা করছে যা মাযহাবের সাবেক ইমামকে অবিশ্বাস করাকে ইঙ্গিত করে। পূর্বে উল্লেখ্য লেখা অনুসারে, সালেফে সালেহীনরা যে অজ্ঞ কিংবা মূর্খ ছিল এটা বলা কুফর হবে। ইতিহাস দেখলে বুঝা যায় যে, অনেক লোক উপাসনায় পরিবর্তন এবং আহলে সুন্নাহর ইমামগণকে অপমান করতে চেয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে, যারা বলে যে মাযহাবের রুখস তথা সহজ কাজগুলো নির্বাচন করতেন এবং চার মাযহাবকে বিলুপ্ত করতে তাদের দাবি যে তারা এসব মাযহাবের কিতাবগুলোর একটি পৃষ্ঠাও সঠিকভাবে পড়তে বা বুঝতে পারে না। বরং, মাযহাব ও ইমামগণের শ্রেষ্ঠত্বকে বোঝার জন্য তাদেরকে গভীরভাবে শিখা দরকার।

যেব্যক্তি গভীরভাবে শিখে সে মানুষকে অজ্ঞ ও বোকা পথের মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে না। ইতিহাসের অজ্ঞ ও নাস্তিকেরা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আহলে সুন্নাহর আলেমদের অনুসরণীয় পণ্ডিতগণ চৌদ্দশত বছরের প্রতিটি শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিল এবং হাদিসে প্রশংসিত হচ্ছে যারা মানুষকে সুখের দিকে পথ বাতলে দিয়েছিল। আমাদেরও আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ধার্মিক, খাঁটি মুসলমান এবং সেসকল শহিদদের যারা আল্লাহর নামে ও ইসলাম প্রচারের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাদের অনুসরণ করা উচিত। সুতরাং নব্য সংস্কারকের বিষাক্ত, ক্ষতিকারক নিবন্ধগুলোর দ্বারা আমাদের বিপথগামী হওয়া উচিত নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, কায়রো ম্যাসোনিক লজের প্রধান আবদুহ এর বিষাক্ত ধারণা সম্প্রতি মিশরে জামি আল-আজহারে ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবে মিশরে এরূপ ধর্মীয় সংস্কারক যেমন (রাশেদ রিদ; জামি আল-আজহার এর রেক্টর মুস্তফা আল মারাহাগি, কায়রোর মুফতি আবদুল মাজেদ, আস-সালাম মাহমুদ, মুহাম্মদ আস-সালহুত, তানতাওয়ী আল জাওহারী, আবিদ আর রাজ্জাক পাশা, জাকির আল-মুবারক, ফরিদ-আল ওয়াজেদী, আব্বাস' আক্কাদ, আহমদ আমিন, ডাক্তার তোহা হুসাইন পাশা, কাসিম আমান, এবং হাসান আল-বান্না এর আবির্ভাব ঘটেছে। এমন কি দুঃখজনকভাবে বলতে হবে যে, যেমন তাদের কর্তা আবদুহ' কে আধুনিক মুসলিম পণ্ডিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং তাদের বই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বহু অজ্ঞ ধর্মীয় পুরুষ এবং যুব মুসলমানকে সঠিক পথ থেকে পথভ্রষ্ট করেছে। হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মহান ইসলামিক মুজাদ্দিদ সাইয়্যিদ আব্দুল হাকীম আরওয়াসী (রহ.) বলেন, কায়রোর মুফতি আবদুহ ইসলামি আলেমদের মাহাত্ম্য বুঝতে পারলো না বরং তিনি নিজেকে ইসলামের শত্রুদের হাতে বিক্রি করেছিলেন এবং অবশেষে একজন ফ্রিম্যাসন ও হিংগ্র কাফির হচ্ছে ইসলামকে ধ্বংস করেছে। আব্দুহ এর মতো যেসব লোকেরা যারা অবিশ্বাস বা বিডিয়া বা ধর্মবিরোধী হয়ে পড়েছিল তারাসর্বদা বিভ্রান্তিকর ক্ষেত্রে যুব সফল মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করতে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতো।

হাদিস শরিফে মহানবী (দ.) পথভ্র"দের উত্তরসূরি যেমন ফাজিরের এর ধর্মীয় মুখোশধারী কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে এ দূর্যোগ আসার ব্যাপারে তার উম্মতদের সর্তক করে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। ১৩২৩ সাল (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) মিশরে আবদুহ মৃত্যুর পরে তার প্রশিক্ষিত শিষ্যরা অলস হচ্ছে বসে ছিলো না বরং তারা বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকারক বই প্রকাশ করেছে যা অভিশাপ এবং ক্রোধের প্রকাশ। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বই হলো রশিদ রিডার মহাভারত। এ বইটিতে তিনি তার মাস্টারের ন্যায় আহলে সুন্নাহর চার মাযহাবের প্রতি আক্রমণ করে মাযহাবগুলের মধ্যকার আদর্শবাদী পার্থক্য ও ইজতেহাদের প্রতিক্রিয়াশীল বিতর্কের পদ্ধতি এবং শর্তাদি ভুল উপস্থাপন করে বলেন, তারা বৈধভাবে অবৈধ হচ্ছে ইসলামি ঐক্য বিনষ্ট করেছে বলে দাবি করে। তিনি লক্ষ লক্ষ সত্য মুসলমানদের নিয়ে রসিকতা সৃষ্টি করেছেন যারা হাজার বছর ধরে এ চার মাযহাবকে অনুসরণ করে আসছে। তিনি ইসলামের পরিবর্তে সমসাময়িক চাহিদার পরিবর্তনের উপায়কে পুঁজি করে ইসলাম থেকে দূরে চলে যান। ধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে সাধারণ একটা বিষয় মিল সেটা হলো, তারা নিজেকে একজন প্রকৃত মুসলমান এবং প্রকৃত ইসলামি পণ্ডিত হিসেবে নিজেকে দাবি করবেন যেন তিনি প্রকৃত ইসলাম ও আধুনিক চাহিদা গুলো বোঝেন। যারা ইসলামিক বইগুলো পড়েছে বোঝা যায় যে, তারা আহলে-সুন্নাহর পণ্ডিতদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এবং তাদের কার্যক্রম রসুল (দ.) এর হাদিস শরিফে প্রশংসিত হচ্ছে। তাদের সময় সেরা সময় ছিলো আর তারা সত্য এবং পবিত্র মুসলমানদের বর্ণনা করে আর অপ্রীতিকরকারীরা অপ্রীতিকরদের অনুকরণ করে। সংস্কারকদের ঘোষণাপত্র এবং নিবন্ধগুলো স্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণিত করে যে, তারা ইসলামের নিয়ম এবং ফিকহের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত যা অজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। হাদিসে এসেছে, "সর্বোচ মানুষ হলেন আলেমরা যাদের কাছে ইমান আছে; "আর আলেমরা হলো নবীর উত্তরাধিকারী" আর হৃদয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালার রহস্যের গোপনীয়তা, ইসলামি আলেমদের ঘুম হচ্ছে ইবাদত। আমার উম্মতদের মধ্যে আলেমদের শ্রদ্ধা করো। কারণ তারা পৃথিবীর নক্ষত্রস্বরূপ আর তারা বিচারের (কিয়ামত) দিন সুপারিশ করবেন। সাথে সাথে ফকিহগণের মর্যাদাও অমূল্য। আলেমদের সংস্পর্শে থাকাও

ইবাদতের একটা অংশ আর একজন আলেম তারঁ শিষ্যদের কাছে একজন নবীর মতো। আমাদের নবী (দ.) কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর আহলে সুন্নাহর পণ্ডিতদের প্রশংসা করেছেন নাকি আবদুহ ও তার নবীনরা পরের দিকে বেড়ে ওঠা কেউ?
এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের নবী (দ.) প্রদান করেছেন এবং আবারও বলেন, "প্রতিটি শতাব্দী এর এর পূর্বেরটির চেয়েও খারাপ হবে।" এ অবনতি কিয়ামত দিবস অবধি চলবে। আর কিয়ামতের দিন কাছে আসার সাথে সাথে ধর্মীয় জায়গার লোকেরা গর্তের মাংসের মতো পচাঁ এমনকি আরও নিকৃষ্ট হবে। এ হাদিসগুলো মুখতাসারুল তাজকিরাত আল-কুরতুবীতে লেখা আছে। সমস্ত ইসলামি পণ্ডিত এবং হাজার হাজার আউলিয়া যাদের রসুল (দ.) প্রশংসা করেছেন তারা ঐকমত্যভাবে এ সুসংবাদের ঘোষণা করেছেন যে, জাহান্নাম থেকে একমাত্র পরিত্রাণ পাওয়ায় পথ বাতলে দেয়ার যোগ্য ইসলামি পণ্ডিতরা হচ্ছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত আর যারা তাদের অনুসরণ করবে না কিংবা সুন্নী হবে না তারা জাহান্নামে যাবে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে এটাও বলেন যে, তালফিক (মিশ্রণিকরণ) তথা চারটি মাযহাবের রূখসকে নির্বাচন ও একত্রিত করে নতুন একটি ভ্রান্ত মাযহাব তৈরি করা সম্পূর্ণ একটি ভুল এবং হাস্যকর বিষয়। একজন যুক্তিশীল ব্যক্তি কি আহলে সুন্নাহর পথ অনুসরণ করে যা ইসলামি আলেমদের সর্বসম্মতিতে প্রশংসিত হচ্ছে যা লক্ষাধিক বছর আগে এসেছিল নাকি তিনি বিশ্বাসঘাতক সভ্য, প্রগতিশীল নামক ইসসলামের অজ্ঞানদের কথা বিশ্বাস করবে যারা সম্প্রতি শতাব্দীতে আবির্ভূত হচ্ছে?
ঐতিহাসিক বাহাত্তর সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও বাচালরা যে জাহান্নামে যাবে তা আল্লাহর আয়াত ও রসুল (দ.) হাদিসে ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তারা সবসময় আহলে-সুন্নাতের আলেমদের আক্রমণ এবং মুসলমানদেরকে তাদের কলুষিত পথের সুসংবাদ দিতে চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হয় বরং বিপরীতে তারা পথভ্রষ্ট ও লজ্জিত হচ্ছে। যখন দেখা গেলো তারা আহলে-সুন্নানের বিরুদ্ধে জ্ঞান দিয়ে তারা ব্যর্থ হলো তখন তারা মুসলমানদের হত্যার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং প্রতি শতাব্দীতে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। অন্যদিকে, আহলের সুন্নাতের চার মাযহাবের মুসলমানরা সবসময় একে অপরকে ভালোবাসে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। রসুলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেছেন যে, মুসলমানদের দৈনিক জীবনের বিষয়গুলোতে মাযহাবের মধ্যে যে ভিন্নতা তা তাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ। কিন্তু রশিদ রিডার ১২৮২ সালে [১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ] জন্মগ্রহণ এবং ১৩৫৪ সালে [১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ] কায়রোতে হঠাৎ মারা যান, এবং এরূপ ধর্ম সংস্কারকরা চেয়েছিলো যে, চার মাযহাবকে একত্রিত করে তারা ইসলামি ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে। অন্যদিকে আমাদের নবী (দ.) সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন চার খলিফার অনুসৃত ইমামগণের যেকোন একটি মাযহাব অনুসরণ করে সঠিক পথে ধাবিত হয়। ইসলামি মাযহাবের ইমাম গণ (রহ.) চার খলিফার কার্যক্রমকে একসঙ্গে অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তা কিতাবে স্থানান্তরিত করেন। এবং তারা রসুল (দ.) নির্দেশিত আদেশানুসারে এ অনন্য পথের নামকরণ করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। সারা বিশ্বের সকল মুসলমানদের আহলে সুন্নাতের এ একক উপায়ে একত্রিত হতে হবে। যারা ইসলামে ঐক্য ও একতা কামনা করে এবং তাদের কাজে আন্তরিক হয়, তাহলে তাদের এ ঐক্য প্রতির মিশনে যোগদান করা উচিত। বিপরীতে ফ্রিমাসনস এবং জিন্দিক যারা ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে এবং তারা সবসময় ঐক্য হিসাবে মিথ্যা কথা ও শ্লোগানের আমরা ঐক্য আনবো বরং তারা মুসলমানদের প্রতারণা এবং ইমামগণের মধ্যকার ঐক্যকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্তি করণে লিপ্ত ছিলো।
ইসলামের শত্রুরা ইসলামের প্রথম শতাব্দী থেকে ইসলামকে বাতিল করার চেষ্টা করে আসছে। বর্তমানের ফ্রিমেশনস, কমিউনিস্ট, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা হামলার নানা পরিকল্পনা সংগঠিত করেছে। এছাড়াও ঐতিহ্যবাহী মুসলমানদের তারা জাহান্নামি ঘোষণা এবং আহলে সুন্নাহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপসহ সঠিক পথের সকল অনুগামীদপর পথভ্রষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে তারা আহলে সুন্নাতকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করে আসছে। এ আক্রমণগুলো বৃটিশদের দ্বারা অগ্রগামী হচ্ছে যারা তাদের সমস্ত ইম্পেরিয়াল সম্পদ, ট্রেজারি, সশস্ত্র বাহিনী, ফ্লাইট, প্রযুক্তি, রাজনীতিবিদ এবং লেখকদের এ অযৌক্তিক যুদ্ধে নিয়োগ করেছে। এভাবে তারা পৃথিবীর দুই সর্বশ্রে মুসলিম দেশ যারা আহলে সুন্নাহকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে যেমন– গৌরগানিয়া[২৫] এবং অটোমান ইসলামিক সাম্রাজ্য যা তিনটি মহাদেশের বিস্তৃত হয়েছিল। তারা সব দেশে হতে ইসলামের মূল্যবান বই ধ্বংস করেছে এবং অনেক দেশ থেকে ইসলামিক শিক্ষা দূর করে দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্টরা বেশিরভাগই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তখন তারা একটি ত্রাণ সহায়তা পায় যা বৃটিশকে তাদের শক্তি অর্জনের জন্য এবং সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পুনরায়

---

[২৫]. তৎকালীন ত্রিমুর রাজ্য বা বাবরের সাম্রাজ্য বলা হয় যেটি ৯৩৩ সালে [১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে] জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (রহ.) ৮৮৮ সাল [১৪৮২ খ্রিস্টাব্দ] - ৯৩৭ সাল [১৫৩০ খিষ্টাব্দ]), যিনি তৈয়মুর খানের (তামর্লাইন) পঞ্চম প্রজন্মের বংশধর, তাকে ইরিম টিমুর গুরজান (রহ.) নামেও ডাকা হয় (৭৩৬ সাল [১৩৩৬ খিষ্টাব্দ] - ৮০৭ সাল [১৪০৫]। দয়া করে হাকিকাত কিতাবেভীর প্রকাশিত "Confessions of a British Spy" শিরোনামে বইটি দেখুন।

সহায়তা করে। ১৯১৭ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী (১৯০২-০৫) জেমস বেলফুর একটি জিউনিস্ট সংগঠন প্রতি করেন যেটি মুসলমানদের পবিত্র স্থান ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পুনর্বিবেচনা করার জন্য কাজ করে এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক এ সংগঠনের দেওয়া অবিচ্ছেদ্য সমর্থনের ফলে ১৩৬৬ সালে [১৯৪৭ খিষ্ট্রাব্দ] ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতি লাভ করে। এ বৃটিশ সরকার পুনরায় ১৩৫১ সালে [১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ] এ উপদ্বীপের আরব উপদ্বীপকে সৌদি পুত্রদের হাতে তুলে দিয়েছিল যা তারা অটোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে হস্তগত করেছিল। এভাবে তারা ইসলামের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি হচ্ছে উঠেছিল। আবদুর রশীদ ইব্রাহিম ইফেন্ডী তার দ্বিতীয় ভলিউমের ইসলামের প্রতি বৃটিশদের শত্রুতা নামক একটি নিদর্শনে আলম-ই ইসলাম নামক তুর্কি কিতাবে যা ১৩২৮ সালে ১৯১০ [খিষ্ট্রাব্দ] ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়, সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, বৃটিশদের মূল লক্ষ্য ছিলো যে যত দ্রুত সম্ভব ইসলামি খেলাফতকে নির্মূল করা। এটি ছিল তাদের সৃষ্ট একটা ষড়যন্ত্র যাতে তারা ইসলামি খেলাফত ধ্বংস করতে পারে সেই মন্ত্রে ক্রিমন তুর্কিদের অটোমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলো। প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে তাদের গোপন ও জটিল উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারা ১৯২৩ সালে অনুতি লোভান চুক্তিতে যেসব প্রস্তাব তৈরি করেছিল তাতে তাদের অন্তরের শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যে ছদ্মবেশে তারা তুর্কিদের উপর বিভিন্ন দুর্যোগের ছক একেঁছিল সব কিছু বৃটিশদের সহায়তায় ঘটেছিল। বৃটিশদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল ইসলামকে ধ্বংস করা, কারণ তারা সবসময় ইসলামকে ভয় করতো। তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার জন্য ভাড়াটে বিবেক তথা শত্রু ব্যবহার করতেছে। এ বিশ্বাসঘাতক এবং ভণ্ড মানুষগুলোকে বৃটিশরা ইসলামি পণ্ডিত হিসেবে উপস্থাপন করে আসতেছে। এককথায়, ইসলামের সর্বশ্রে শত্রু হলো বৃটিশ। শত শত বছর ধরে শুধু বৃটিশদের রক্ত দ্বারা মুসলিম দেশগুলো পথভ্রষ্ট হয় নি বরং স্কস্টস ফ্রিমানসরাও হাজার হাজার মুসলমান ও ধর্মীয় পুরুষকে প্রতারিত করে তাদেরকে ফ্রিম্যানস তৈরি করে এবং মানবতার সেবা ও ভ্রাতৃত্বের নাম করে তাদেরকে মিথ্যা বাণী শুনিয়ে ইসলাম হতে পথভ্রষ্ট করে ফলে তারা স্বেচ্ছায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। ইসলামকে পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্য তারা এসব যাজক ধর্মত্যাগীদেরকে সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করে। (এভাবেই মুস্তাফা রশিদ পাশা, আলী পাশা, ফুয়াদ পাশা, মিদাত পাশা এবং তালিত পাশাদের মতো ফ্রিমানসর) ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করার কাজে অভ্যস্ত ছিলো। জামালুদ্দীন আল আফগানী, মুহাম্মদ আবদুহ এবং তাদের প্রশিক্ষিত শিষ্যদের মতো ফ্রিমানসরা ইসলামিক জ্ঞানকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য (বিড়ালের বিধানসভার ন্যায় লিপ্ত ছিল)। মুসলমানদের ধর্ম ও বিশ্বাস নির্মূলনকরণে তাদের শিষ্য যারা ধর্মীয় পদস্থ তাদের দ্বারা লিখিত শত শত ধ্বংসাত্মক এবং বিদ্রোহী বই যেমন মিশরের রশিদ রিডার দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত মহাভারত বিভিন্ন মুসলিম দেশে ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছিল। ফলে দেখা যায় যে, যেসব মুসলিম তরুণরা আহলে সুন্নাহর কিতাবগুলো পড়ে নি অথবা বুঝতে পারে নি তারা বাতেলদের দ্বারা সৃষ্ট জালে পা দিয়েছে এবং তারা ধ্বংসস্তূপে ধাক্কা দিয়েছে ফলে তারা ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে গেছে। মহাভারত বইটি আহলে সুন্নাতের চার মাযহাবকেই আক্রমণ করে যা ইসলামিক জ্ঞানের চারটি উৎসের অন্যতম আলেমগণের ইজমাকে অস্বীকার করে এবং বলা হচ্ছে যে, কুরআনুল কারিম ও হাদিসে যেভাবে বলা হচ্ছে সেভাবে আমল করতে হবে। সুতরাং এটি ছিলো একটা ইসলামি শিক্ষা নির্মূলের অপ্রচেষ্টা।[২৬]

"খোলাসাতুত-তাহকীক" কিতাবের শেষে বলা হচ্ছে যে, একজন মুসলিম হয় মুজতাহিদ হচ্ছে উঠেছে কিংবা ইজতেহাদের গ্রেডের কাছে পৌঁছেনি। মুজতাহিদ হলো মুতলাক (পরম) বা মুকাইয়েদ (মাযহাবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত)। একজন মুতলাক মুজতাহিদের অন্য মুজতাহিদকে অনুসরণ বৈধ নয়; বরং তিনি নিজের ইজতেহাদকে অনুসরণ করতে হবে। তবে মুকাইয়েদ মুজতাহিদের জন্য একজন মুতলাক মুজতাহিদদের মাযহাবের পদ্ধতি অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং তাকে তিনি নিজের ইজতেহাদ যে কাজের নির্দেশ দেন সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নন-মুজতাহিদরা তাদের ইছা অনুযায়ী চার মাযহাবের যেকোন একটিকে অনুসরণ করতে পারবে। যাহোক, একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে কাজ করার সময় তাদের মাযহাবের আরোপিত সমস্ত শর্তাবলী সঠিকভাবে পালন করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি তারা শর্তাবলিগুলো একটিও পালন না করে তবে তাদের কাজ (উপাসনা) সহীহ হবে না যা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল (ব্যর্থ) বলে স্বীকৃত। যদিও তাদের

---

[২৬]. এই বইয়ের ট্রিকস এবং ক্ষতি মুসলমান ভাইদের জানাতে আমরা ১৩৯৪ সাল (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে) "ইসলামের শত্রুদের উত্তর " নামক একটি কিতাব প্রস্তুত করেছি যা তুর্কি ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও, ভারতের বিখ্যাত উলামা গণের মধ্যে একজন বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত [আবদুল আল গণী আল নাবুলুসী (রহ.)] এর লিখিত [কুলাসাতুত আত-তাহকীক ফি বায়ানি হুকুমি তাকলীদ ওয়াত তালফীক] কিতাবটি এবং [ইউসুফ আন নাবানী (রহ.)] এর লিখিত 'হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন' কিতাবটি এবং [মুহাম্মদ আবদুর রহমান সিলাহটী (রহ.)]এর লিখিত "সাইফ আল আবরার" কিতাবটি যাদের কিতাবগুলো ওই ক্ষতিকারক বইয়ের সঠিক প্রত্যাখ্যান ছিল, আমরা এই বইগুলো অফসেট প্রক্রিয়ার দ্বারা পুনরায় বানানোর চেষ্টা করেছি এবং প্রকাশিত করেছি যা ইস্তাম্বুল, হাকিকত কিতাবেভী থেকে তুরস্কের মধ্যে পাওয়া যাবে।

বিশ্বাস যে তাদের মাযহাব তেমন উচতর না, বরং তাদের তেমনই বিশ্বাস করা উচিত। তালফিক হচ্ছে এমন কিছু করা বা উপাসনায় যুক্ত করা যা অন্য মাযহাবের সাথে মতানৈক্য তৈরি করে অথবা সব মাযহাবকে একত্রিত করে নতুন কোন মাযহাব সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা যা চার মাযহাবকে অস্বীকার করে পঞ্চম একটি মাযহাব সৃষ্টির অপচেষ্টা। এক মাযহাবের সাথে অন্য মাযহাবের মিশ্রণিকরণে কোন উপাসনা সহীহ হবে না বরং এটি নিরর্থক হবে এবং ইসলামের সাথে একটি খেলা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো নাজাসাত হাউদ কেবার কম এবং কমিউইন[২৭] (ওবাদের চেয়েও বেশি) কিছু পানিতে পতিত হয় এবং যদি পানির রঙ, স্বাদ বা গন্ধের কোন পরিবর্তন না হয় এবং যদি কোনো ব্যক্তি এ পানি দিয়ে নিয়ত ছাড়া অযু করে, তার দেহের নির্ধারিত কিছু অংশ ধৌত না করেন এবং যদি কেউ সেই অপবিত্রতার হতে মুক্তি লাভে তার হাত ঘষে না নেয় এবং কেউ যদি একটার পর অন্যটা ধারাবাহিকভাবে ধৌত না করেন এবং যদি তিনি বিসমিল্লাহ ব্যতীত তার অযু আরম্ভ করেন তাহলে চার মাযহাবের ইমাম (রহ.) গণের মতানুসারে তার অযু শুদ্ধ হবে না। আর যে এসব করার পর অযু শুদ্ধ হচ্ছে বলবে, সে যেন পঞ্চম একটি মাযহাবকে তৈরি করলো। এমনকি একজন মুজতাহিদ চার মাযহাবের ইমামগণের মতামতকে অস্বীকার করে পঞ্চম একটি মতামত প্রদান করতে পারে না। [কোয়ালাটন সমান পরিমাণে উল্লিখিত পানির পরিমাণ নিয়ে Endless Bliss নামক কিতাবে সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ ফ্যাসিলে/ পরিছদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।] সদর আশ-শরিহ তার বইয়ে লিখেছেন যে যখন সাহাবায়ে কারিম হতে কোন বিষয়ে ভিন্ন দুই ধরণের প্রতিবেদন আসে তা ইসলামি পণ্ডিতদের ঐক্যমত্যে তৃতীয় কোন প্রস্তাবের সম্মুখীন হওয়ার অনুমতি নেই। তাদের মতো প্রতিটি শতাব্দীর ইসলামি পণ্ডিতরা সাহাবায়ে কেরামের কথাগুলোকে অনুসরণ করেছিলো। মোল্লা খসরু (রহ.) তার মিরাতে আল উসূল নামক কিতাবে লিখেছেন যে যখন কিছু প্রথম শতাব্দীর পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রেরিত হয় কোন বিষয়ে প্রতিবেদন ভিন্ন দুটি মতামত পরিলক্ষিত হতো তখন ইমামগণের ঐকমত্য অনুযায়ী তৃতীয় কোন প্রতিবেদনের শরণাপন্ন হওয়ার অনুমতি ছিলো না। এটা বলা সঠিক যে, প্রতিটি শতাব্দীর পণ্ডিতরা সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করেছিলেন। আল জালালাইন তাফসীর কিতাবের প্রথম লেখক জালালুদ্দীন মিহালী আস সূয়ুতীর লিখিত কিতাব জামে আল জাওয়ামির মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন) ইজমাকে (ইসলামি পণ্ডিতদের ঐক্যমত্যের সাথে মতবিরোধে) অস্বীকার করা হারাম। এটি কুরআনুল কারিমে নিষিদ্ধ। এ কারণে, সালেফে সালেহীনদের মতবিরোধ আছে এমন বিষয়ে তৃতীয় একটি মতামত প্রকাশ করা হারাম। কেউ যেকোন দুটি মাযহাবের মতানুসারে কোন উপাসনা বা কাজ করলো যা নিয়ে আবার তৃতীয় অথবা চতুর্থ মাযহাবের মধ্যকার মতানৈক্য বিদ্যমান সেক্ষেত্রে ইজমার অনুপস্থিতির কারণে চার মাযহাবের কেউ এ কাজ করলে সহীহ হবে না। অন্য কথায়, তালফিক অনুমোদিত নয়। কাসল ইবনে কাত্‌লবাগা আত তাসহীহ কিতাবে লিখেছেন যে, এটা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, ভিন্ন দুটি ইজতিহাদের অনুসরণ করে কোন উপাসনা/ কাজ করা বৈধ নয়। এ কারণে, যদি কোন ব্যক্তি অযু করার সময় তার ভেজা হাত সমস্ত মাথার উপর মাসেহ না করে এবং তারপর তাকে কুকুর স্পর্শ করে এবং তারপর তিনি সালাত সম্পাদন করে সেক্ষেত্রে তার সালাত সহীহ (বৈধ) হবে না। এটি শাফেয়ী মাযহাবের পণ্ডিত শিহাব আবেদীন আহমদ ইবনে আল-ইমাদ (রহ.) এর তাওকীফ আল হুক্কাম কিতাবে লেখা আছে যে, এরূপ সালাত ঐক্যমত্যে ভুল তথা বাতিল বলে গণ্য হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতানুসারে কোন ব্যক্তি তার ভেজা হাত সমস্ত মাথায় মাসেহ না করার কারণে ওই ব্যক্তির ওযু এবং সালাত আদায় শুদ্ধ হবে না এবং তিনি প্রাক্তন ইমামগণের মতে, ওযুর অন্যতম একটি ফরয ভঙ্গ করেছেন অংশ এবং পরবর্তী ইমামগণের মতে, তিনি একটি কুকুর স্পর্শ করেছেন, যা তার অযুকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং বাতিল। একজন হানাফি পণ্ডিত মুহাম্মদ আল বাগদাদী (রহ.) তাকলিদ শিরোনামে তাঁর পুস্তিকায় লিখেছেন : "অন্য মাযহাবের অনুকরণের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে। তন্মধ্যে প্রথমটি হলোঃ যা ইবনে হুমাম তাঁর "তাহরির" রচনাতে উল্লেখ করেছেন, কোনো ব্যক্তি নিজের মাযহাব অনুসারে কোন কাজ আরম্ভ করে তা সম্পাদনে অন্য মাযহাবের অনুকরণ করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ হানাফি মাযহাব অনুসারে অযু করে শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে তার সালাত সম্পাদন করতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্তটি হলো, আহমদ ইবনে ইদ্রিস আল কারাফী "তাহরির" কিতাবের ইবনে হুমামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কোন ব্যক্তি যে উপাসনা করছেন তা যে মাযহাবকে অনুসরণ করছেন তা উভয়ই দ্বারা অবৈধ হবে এমনটা বিবেচনা করা উচিত না বরং তিনি যদি শাফী মাযহাবকে অনুসরণ করে অযু করে এবং অযুতে তার শরীরের নির্ধারিত অংশগুলো না ঘষে/স্পর্শ না করে এবং বিবাহের অনুমতিযোগ্য কোন মহিলাকে স্পর্শ করে যা মালেকী মাযহাব অনুসারে তার অযু ভঙ্গ হবে না অতঃপর ওই অযু দ্বারা সে সালাত সম্পাদন

[২৭]. হাউদ কবির, 'বড় পুকুর ' কমপক্ষে ২৫ বর্গ মিটারের; কুলাতাইন, ২১৭.৭৬ কেজি।

করলে তা উভয় মাযহাব অনুসারে বৈধ হবে না। তৃতীয় শর্তটি হলো, মাযহাবের মধ্যে কারো রুখসাত[২৮] তথা সহজ বিষয়াবলী অনুসন্ধান করা উচিত নয়। ইমাম আন নবী এবং ইসলামের অনেক আলেম এ শর্তাবলির বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। ইবনে হুমাম এ শর্তের বিষয়টি বর্ণনা করেননি। হাসান আশ-শের্নব্লালি তাঁর আল আকায়েদুল ফরয গ্রন্থ লিখেছেন যে, "নিকাহে দম্পতির অভিভাবকের উপস্থিতি ব্যতিরেকে (এমন অভিভাবক যারা দাম্পত্য জীবনে পর্দাপণ করে নি) যদি বিবাহ সম্পাদন করে তাহলে হানাফি মাযহাব অনুসারে এবং যদি সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সম্পাদিত হয় তাহলে তা শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে বিবাহ সহীহ (বৈধ) হবে। তবে, অভিভাবক এবং সাক্ষী উভয়ের অনুপস্থিতিতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এটি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা খুব কঠিন হবে। কারণ, জরুরত[২৯] ব্যতীত এ তৃতীয় শর্ত পালনে অন্য মাযহাবকে অনুসারণ করা নিষিদ্ধ। এটি বলা হয়ে থাকে যে, একজন ইসলামি পন্ডিতের পরামর্শ ব্যতীত অন্য মাযহাবের অনুকরণ করা সহীহ হবে না। এখানে আমরা মুহাম্মদ বাগদাদির উদ্ধৃতি শেষ করছি। ইসমাইল আন-নাবালুসী (রহ.) তাঁর "আদ-দুরারের" টিকায় আল-আকাইদুল ফরয কিতাবে বলেছেন যে কোন ব্যক্তিকে শুধু একটি এক মাযহাবের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে না, তিনি অন্য মাযহাবের অনুকরণ করেও কাজ/ উপাসনা করতে পারবেন। তবে, তখন অন্য মাযহাবের কোন উপাসনায় সংযুক্ত আপনাকে সমস্ত শর্ত পালন করতে হবে। (আপনি দুই মাযহাবের দুধরনের কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ভিন্ন দুটি উপায়ের মাযহাবদ্বয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।) অন্য মাযহাবের কোন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে শর্তাবলি খেয়াল করার বিষয়টা এটাই প্রমাণ করে যে, তালফীক করা সহীহ (বৈধ) নয়। প্রখ্যাত হানাফি পণ্ডিত আব্দুর রহমান আল ইমাদী (রহ.) তাঁর "আল-মুকাদ্দিমা" গ্রন্থে বলেছেন যে "একজন ব্যক্তি জরুরতের ভিত্তিতে তিন মাযহাবের যেকোন একটি অনুকরণ করতে পারবে। তবে, সেই নির্দিষ্ট উপাসনা/ কাজের জন্য আরোপিত প্রয়োজনীয় সমস্ত শর্তগুলো পালন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন হানাফি শাফেয়ী মাযহাবকে অনুকরণ করে কোয়ালাটাইন পরিমাণ নাজাসী পানি দিয়ে অযু করলো এমতাবস্থায় তাকে আনুানিকভাবে অযুর নিয়ত এবং শরীরের নির্ধারিত অঙ্গসমূহ তার হাত দিয়ে ঘষে নিতে হবে এবং ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের সময় সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত এবং সঠিকভাবে তাদিলে আরকানসমূহ পালন করতে হবে। এটি সর্বসম্মতিক্রমে উল্লেখ্য যে, যদি ওই ব্যক্তি উল্লেখিত সব শর্তাবলি পালন না করে তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে না। তারঁ মন্তব্য হলো জরুরত একটা অনাবশ্যক বিষয়। জরুরত দ্বারা তিনি অবশ্যই অন্য মাযহাবকে অনুসরণ করার প্রয়োজন কে বুঝিয়েছেন সকল ইমামগণের ঐক্যমত্যে একজন ব্যক্তি একটানা একই মাযহাব অনুসরণ করতে হবে না। কোন ব্যক্তি নিজ মাযহাবে যদি কোনো অসুবিধা (হরাজ) দেখা দেয় অন্য জনের মাযহাব অনুসরণ করতে পারবে। এতো কিছু বলার একমাত্র কারণ মাযহাবের মধ্যে তালফীক (একীকরণ) সহীহ নয়। ইবনে হুমাম (রহ.) এর তাহরির কিতাবের কোন বক্তব্য তালফীক যে সহীহ এমন কিছু ইঙ্গিত করে না মুহাম্মদ আল-বাগদাদি এবং আল-ইমাম আল-মানবী লিখেছেন যে, ইবনে হুমাম (রহ.) তার ফাতিহ আল কাদির বইটিতে বলেছেন যে, "একটি ইজতিহাদ বা নথিকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে নিজেকে অন্য মাযহাবে স্থানান্তর করা নিজেকে স্থানান্তর করা পাপ। এরূপ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতে হবে। এমনকি ইজতিহাদ ব্যতীত অনুমতিক্রমে কোন কিছু স্থানান্তরও আরো অধিক খারাপ। এক্ষেত্রে স্থানান্তর মানে হচ্ছে অন্য কোনো মাযহাব মেনে কোন ইবাদত করা।

কেউ কেবল স্থানান্তরিত হচ্ছে তা বলে স্থানান্তর করতে পারে না বরং এটিকে প্রতিশ্রুতি বলা হয়, স্থানান্তর নয়। যদিও কেউ এমনটি বলে, তবে তার সেই মাযহাব অনুসরণ করতে হবে না। এ আয়াতে কারিমা আমাদের নির্দেশ দেয় যে, তোমরা যা জানো না সে সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত/ জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, তবেব ধর্মীয় নিয়মনীতির বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন ইসলামি পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ইসলামি পণ্ডিতদের কারো মাযহাব পরিবর্তনের নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো যাতে কেউ অন্য মাযহাবের রুখসা তথা সহজ বিষয়গুলোর প্রতি ধাবিত না হয়। একাধিক পণ্ডিতদের মতে, প্রত্যেক মুসলিম সবদিক বিবেচনায় যে মাযহাবটি নিজের কাছে সহজতর হয় সেটি অনুসরণ করতে পারবে। যদি কোনও অজ্ঞতাবাদীরা বলেন যে, ইবনে হুমামের সর্বশেষ বিবৃতিটি মাযহাবগুলোর এত্রীকরণকে সহীহ প্রমাণ করে, তার এ যুক্তি ভুল। কারণ, ইবনে হুম্মামের বিবৃতিটি দেখায় যে, প্রত্যেকের অবশ্যই একটি মাযহাব অনুসরণ এবং তার মধ্যে থেকেই তার বিধিবিধানগুলো পালন করা উচিত সব মাযহাব একত্রে অনুসরণ করে নয়। ধর্ম সংস্কারকরা এবং যারা এটিকে বুঝতে

---

[২৮]. †কান উপাসনা সম্পাদন করার সহজ উপায় যেটি আজমত তথা কাঠিন্য এর বিপরীত যেটি তুলনামূলক কঠিন তবে উত্তম মাধ্যম। দয়া করে "Endless Bliss" এর সপ্তদশ অধ্যায়ের ষ ফ্যাসিকল/ পরিচ্ছদটি দেখুন।

[২৯]. জরুরত এমন পরিস্থিতি যা কোনো ব্যক্তিকে নিজ মাযহাব যা ফরয এমন কাজ সম্পাদনে এবং অন্য মাযহাব অনুসরণ করায় সাহায্য করার ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করে।

পারে না তারা ইবনে হুম্মামকে তারা তাদের নিজের জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করলো। পক্ষান্তরে, ইবনে হুমাম তারঁ তাহরির কিতাবে স্পষ্ট করে লিখেছেন যে, মাযহাব সমূহের একত্রিতকরণ বৈধ নয়। ইসলামের সংস্কারকরা ইবনে নুযাইম (রহ.) এর একটি উক্তিকে তালফীকের অনুমোদনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে দলীল হিসেবে নির্দেশ করে যে, যা কাজী খান কর্তৃক ইস্যুকৃত ফতোয়ায় লেখা আছে যে, যদি এক টুকরো জমি ওয়াকফ হিসাবে উৎসর্গীকৃত হয় সেই অঞ্চলটি [ফাসীহ (অত্যধিক)] মূল্যে বিক্রি হয় তবে এটি আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে, অবৈধ হবে। কারণ, অত্যধিক দামে বিক্রিত হচ্ছে। অন্যদিকে, আবু হানিফার মতে, জায়গার প্রতিনিধির পক্ষে এটি অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা বৈধ আছে।[৩০]
সুতরাং উভয় ইজতিহাদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈধতার একাত্মা প্রকাশ করেছে। যাইহোক, এ উদাহরণে একই মাযহাবের মধ্যে তালফীক করাকে নির্দেশ প্রদান করছে। উভয়ের রায়ের ফলাফল উসূলে একই। দুই মাযহাবের তালফীকের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটে না। আরেকটি প্রমাণ যে ইবনি নুজায়ামের নিজস্ব বক্তব্যে তিনি বলেন নি যে তালফীক জায়েয় যে বক্তব্যটি তার লিখিত কানাজ[৩১] কিতাবের (বাহারুর রাইক) নামক প্রারম্ভিকতায় উল্লেখ রয়েছে এভাবে, কোন ব্যক্তি যিনি ইমাম এবং জামায়াত পরিচালনা করেন তিনি ব্যতীত তার মুসল্লিগণ অন্য মাযহাবের এমতাবস্থায় তাকে তার মুসল্লিদের মাযহাবকেও অনুসরণ করতে হবে। এইখানে আমরা খোলাসাতুত তাহকীক এর সর্বশেষ অংশের অনুবাদ শেষ করছি।
ভারতের ইসলামিক পণ্ডিত মুহাম্মদ আবদুর রহমান সিলাহেটী (রহ.) তার ফরাসি সাইফুল আবরার আল-মাসলুল আলাল-ফুজ্জার নামক কিতাবে বলেন যে, যখন হাদিস শরিফের ব্যাখ্যা করা হয় সহজভাবে করুন, কঠিনভাবে নয়। তার মন্তব্যে আল্লামা হাফিজ হাসান ইবনে মুহাম্মদ আত-তায়েবী[৩২] তার মিশকাত শিরোনামে বলেন যে, যেব্যক্তি মাযহাবের মধ্যে সহজ বিষয়াবলীর সমন্বয় করে সে জিন্দিক হচ্ছে যায়। সংক্ষেপে :

১. প্রত্যেক মুসলমানকে চারটি মাযহাবের যেকোন একটি অনুসরণ করতে হবে যখন তিনি কোন কাজ বা উপাসনা সম্পাদন করে। চার মাযহাবের ইমামগণ সুন্নি নয় এমন কোন আলেমকে অনুসরণ করা বৈধ নয়।
২. প্রত্যেক মুসলমান পছন্দমত এবং সহজবোধ্য চার মাযহাবের যেকোন একটিকে অনুসরণ করতে পারে। নিজ মাযহাব এবং অন্য মাযহাবের আইন অনুসারে বিধিমালা পালন করতে পারবে।
৩. নিজ মাযহাবের পাশাপাশি একাধিক মাযহাবের বিধিবিধান পালন করার সময় অপর মাযহাবের বিশুদ্ধতার এবং কৃত কাজ বৈধ হওয়ার জন্য সেই মাযহাবের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করতে হবে। যাকে তাকওয়া বলা হয় এবং এটি খুব ভাল। যে অন্য মাযহাবের তাকলীদ অনুসরণ করবে তার সেই মাযহাবের শর্তাবলী পালন করতে হবে। এ শর্তে অন্য মাযহাব অনুসরণ করা অনুমোদিত। যে, সে সমস্ত শর্তাবলী পালন করবে। কারো উপাসনা যদি তার অনুসৃত মাযহাব অনুসারে সহীহ না হয়, এটাকে তালফীক বলা হয়, যা কখনই অনুমোদিত নয়।
৪. একজন ব্যক্তির সর্বদা যে একটা মাযহাবের অধীনে সংযুক্ত থাকতে হবে না। প্রত্যেকে নিজেকে নিজের পছন্দমত অন্য মাযহাবে যেকোন সময় স্থানান্তর করতে পারে। নিজেকে যে কোনও মাধবের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। সেই মাযহাবের ফিকহের শিক্ষা ভালোভাবে শিখতে হবে, যা ইলম আল-হাল বই থেকে শিখে নেওয়া যায়। তাছাড়া, একটি মাযহাবের সাথে সারাক্ষণ যুক্ত থাকা সহজ কাজ। তবে নিজেকে কোন বিশেষ প্রয়োজন স্থানান্তরণ কিংবা কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুকরণ করা একটি কষ্টসাধ্য কাজ। এটি কেবল খারাজ তথা কষ্টের কারণে অন্য মাযহাবের সকল নিয়মাবলী পালন করার শর্তে করা যেতে পারে। তাছাড়া, ফিকহের জ্ঞান শেখাও খুব কঠিন এবং অন্য মাযহাবে স্থানান্তরে ফিকহের আলেমগণ অজ্ঞদের নিষেধ করেছিলেন অর্থাৎ যারা ফিকহের জ্ঞান রাখে না, তারা অন্য মাযহাবের করতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, হানাফি মাযহাবের কোন ব্যক্তির যদি কোন ক্ষত/ আঘাতের কারণে সারাক্ষণ রক্তক্ষরণ হতে থাকে যার জন্য তিনি প্রতি সালাতের ওয়াক্তে অযু করতে পারেন না, কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী উপরোক্ত পরিস্থিতিতে সেই মাযহাবের শর্তাবলী পূরণ ব্যতীত সালাত আদায় বৈধ নয়। ইবনে আবেদীন এ সম্পর্কে বিস্তারিত (তাজির) ব্যাখ্যা করেছেন। আহলে সুন্নাহর আলেমগণ কোন খারাজ (অসুবিধা) ব্যতীত অজ্ঞাতের উপাসনা রক্ষার্থে অন্য কোন মাযহাব

---

[৩০]. দয়া করে ওয়াকফ ও গাবন ফাহিশ' তথা (অতিরিক্ত মূল্যে)র বিস্তারিত জানার জন্য যথাক্রমে "Endless Bliss " কিতাবের চল্লিশতম অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছদ এবং ত্রিশতম অধ্যায়টি স্ক্যান করুন। এছাড়াও " ইসলামের সংস্কারকগণ" শিরোনামে আমাদের প্রকাশনাগুলোর অন্যতম একটি বই যেটি ইসলামকে পূর্ণনির্মানের প্রচেষ্টা করেছিল এমন লোকদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য সরবরাহ করে।

[৩১]. খোলাসাতুত-তাহকীক, চূড়ান্ত অংশ।

[৩২]. আত-তাইয়েব ৭৪৩ (১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ) তে দামেস্কে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণ ভারতে ১৩০০ (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুসরণের বৈধতার অনুমোদন দেন নি। তাওয়াতী এভাবে লিখেছেন যে, তাফসীরকার কিছু পণ্ডিতরা বলেছেন যে সূরা আল ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধরে রাখো অথার্ৎ ফকিহগণের কথাকে অনুসরণ করো।আর যারা ফিকাহের বই অনুসরণ করবে না তারা হারসীতে পতিত হবে এবং আল্লাহর সাহায্য হতে বেরিয়ে আসবে এবং জাহান্নামের আগুনে পোঁড়ানো হবে। হে মুমিনগণ! তোমরা এ আয়াতে কারিমাকে অনুধাবন করো এবং খুশির সংবাদ প্রাপ্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দলভুক্ত হচ্ছে যাও যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নাম হতে রক্ষা করবেন। এ দলের মধ্যে যারা রয়েছে শুধু তাদের জন্য আল্লাহর করুণা ও সাহায্য রয়েছে। যারা এ দলে ক্রোধ ও হিংসার কারণে যোগদান করেনি আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে জাহান্নামে চিকিৎসা তথা শাস্তি দিবে। বর্তমানে আহলে সুন্নাহ জতে হলে চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসরণ করতে হবে আর যেব্যক্তি এ চারটির কোনটিই অনুসরণ করে না সে বিড/ (লা-মাযহাবী) এবং সে জাহান্নামে যাবে।[৩৩] আর দেখা যায় যে, যেব্যক্তি চার মাহযাবের কোনটি অনুসরণ করে না সে লা-মাযহাবী। আর যেব্যক্তি নিজের সহজ উপাসনা অনুসন্ধানের নাম করে চার মাযহাবের মধ্যে তালফীক তৈরি করে সেও লা-মাযহাবী। এছাড়াও যেব্যক্তি চার মাযহাবের যেকোন একটি মাযহাব অনুসরণ করে কিন্তু আহলে সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না সেও লা-মাযহাবী। উপরের তিন শ্রেণির লোকেরা সুন্নী নয় বরং তারা [বিড/ মানুষ যারা বিধর্ম (Dalâla)] অনুসরণ করে। সত্যিকারের মুসলমানরা চারটি মাযহাবের মধ্যেই অনুসরণ করে, সত্যিকারের পথকে বেছে নেয়, অন্য কথায় তারা সুন্নী মুসলমান হচ্ছে যায়। চার মাযহাব একই বিশ্বাসের মতবাদ শেয়ার করে। তাদের মধ্যে কয়েকটি ছোট পার্থক্য হল আল্লাহর মহানুভবতার ফল। প্রত্যেক মুসলিম সহজবোধ্য চার মাযহাবের যেকোন একটিকে পছন্দ করবে।

আল্লাহ তাআলার হামদ করার পর নিচের কথাগুলো লিখছি। হামদের অর্থ হচ্ছে এ বিষয়ে বিশ্বাস করা-আল্লাহ তাআলা একমাত্রই সকল ধরনের নেয়ামত সৃষ্টি করেন এবং আমাদের কাছে পাঠান-এই কথার স্বীকৃতি দেওয়া। নেয়ামত অর্থ হচ্ছে যা প্রয়োজনীয়। শোকর অর্থ হচ্ছে সকল নেয়ামত ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী ব্যবহার করা। নেয়ামতের বর্ণনা আহলুস সুন্নাহর আলিমগণের কিতাবে লেখা আছে। আহলুস সুন্নাহর আলিম হচ্ছেন-চার মাযহাবের আলিমগণ।

ইমাম গাজ্জালী (র) তার কিতাব-কিমিয়ায়ে সাআদত-এ লেখেন-যখন কোনো ব্যক্তি মুসলমান হয়, তখন তার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ফরয হলো-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ-এই বাক্যের অর্থ জানা এবং বিশ্বাস করা। এ বাক্যকে বলা হয় কালিমায়ে তাওহিদ। এ বাক্যের যা অর্থ-তার উপর বিনা সন্দেহে বিশ্বাস করা একজন মুসলমানের জন্য যথে।" যুক্তি সহকারে বা অন্তরের সন্তুষ্টির জন্য একে প্রমাণ করা তার জন্য ফরয নয়।

আল্লাহর রাসুল (দ.) এ সম্পর্কিত প্রমাণ জানতে, উল্লেখ করতে কিংবা কোনো সম্ভাব্য সন্দেহ খুঁজতে, দূর করতে আদেশ দেন নি। তিনি তাদেরকে কেবল বিশ্বাস করতে এবং সন্দেহ না করতে আদেশ দিয়েছেন। এতে বিশ্বাস করা এবং সন্দেহ না করা-সকলের জন্যেও যথে।" তবে প্রত্যেক শহরে কিছু আলিম থাকা ফরযে কিফায়া এবং ঐ আলিমগণের উপর ওয়াজিব হলো দলিল-প্রমাণ জানা, সন্দেহ দূর করা এবং উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। তারা মুসলমানদের জন্য রাখাল স্বরূপ। একদিকে তারা ইমান অর্থাৎ বিশ্বাসের জ্ঞান শিক্ষা দেয়, অন্যদিকে তারা ইসলামের দুশমনদের উত্থাপিত অপবাদের জবাব দেয়। পবিত্র কুরআন কালিমায়ে তাওহীদের অর্থ বর্ণনা করে এবং আল্লাহর রাসুল (দ.) এতে যা ঘোষিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করেন। সকল সম্মানিত সাহাবি এর অর্থ জানতেন এবং তাদের পরবর্তীদের কাছে ঐ অর্থ পৌঁছে দিয়েছেন। সেই সকল মর্যাদাপূর্ণ আলিমগণ-যারা সাহাবিগণ যা পৌঁছিয়েছেন তা কোনো ধরনের পরিবর্তন ব্যতিরেকে তাদের কিতাবে সংরক্ষণ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন-তাঁরাই হচ্ছেন আহলুস সুন্নাহর আলিমগণ। প্রত্যেকেরই আহ্লুস সুন্নাহর আক্বাইদ অর্থাৎ বিশ্বাসসমূহ শিখতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং একে অপরকে ভালোবাসতে হবে। প্রকৃত সুখ নিহিত আছে এ আক্বাইদে এবং ঐক্যবদ্ধতায়। আহলে সুন্নাতের আলিমগণ কালিমায়ে তাওহীদের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেন-মানব জাতি আগে অস্তিত্বমান ছিলো না, তাদেরকে পরে সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের একজনমাত্র সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনিই হচ্ছেন সে সত্তা যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা একজনই। তার কোনো শরিক বা সমতূল্য নেই। তাঁর কোনো দ্বিতীয় নেই। তিনি চিরকাল অস্তিত্বমান। তাঁর অস্তিত্বের কোনো প্রারম্ভ নেই। তিনি চিরকাল অস্তিত্বমান থাকবেন, তাঁর অস্তিত্বের কোনো সমাপ্তি নেই। তাঁর অস্তিত্ব কখনোই লুপ্ত হবে না। তাঁর অস্তিত্ব সর্বদা আবশ্যক। তাঁর অনস্তিত্ব অসম্ভব। তিনি নিজগুণেই অস্তিত্বমান। তাঁর কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। এমন কিছুই নেই যা তাঁর মুখাপেক্ষী নয়। তিনি এমন সত্তা যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের অস্তিত্বে আনয়ন করেন। তিনি কোনো পদার্থ বা বস্তু নন। তিনি কোনো স্থান বা বস্তু থেকে

---

[৩৩]. আত তাওয়াতীর "দুররুল মুখতার" টীকার দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে।

পবিত্র। তিনি আকার ও পরিমাপ থেকে পবিত্র। এটা প্রশ্ন করা যাবে না-তিনি কেমন? যখন আমরা বলি তিনি তখন আমাদের মনে যা আসে বা যা আমরা কল্পনা করতে পারি-তার কোনো কিছুই তিনি নন অর্থাৎ তিনি কল্পনাতীত। কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। সে সকল কিছুই তাঁর সৃ।" তিনি তাঁর সৃষ্টির মতো নন। এ যা কল্পনা করতে পারে প্রত্যেক কিছুর স্রষ্টা তিনি। তিনি দিক ও স্থান থেকে পবিত্র। সমস্ত কিছুই আরশের নিচে এবং আরশ তাঁর কুদরত ও সর্বব্যাপী শক্তির অধীন। তিনি আরশের উর্ধ্বে তার মানে এটা নয় যে আরশ তাঁকে বহন করে। আরশ তাঁর দয়া ও সর্বশক্তির কারণে অস্তিত্বমান। তিনি অনাদিতে যেমন ছিলেন, এখনও তেমন আছেন। তিনি অনন্তকাল তেমনই থাকবেন যেভাবে তিনি আরশ সৃষ্টি করার আগেও ছিলেন। কোনো পরিবর্তন তাঁর সত্তার উপযোগী নয়। তাঁর রয়েছে সত্যিকার নিজস্ব সিফাত বা গুণ। তাঁর আটটি গুণ আছে যেগুলোকে সিফাত আস-সুবুতিয়্যাহ বলে-হায়াত (জীবন), ইলম (সর্বব্যাপী জ্ঞান), সামউ (শ্রবণ), বাসার (দর্শন), কুদরত (সর্বময় শক্তি), ইরাদা (ইছা), কালাম (কথা বা শব্দ) , তাকওয়ীন (গৃষ্টি করার ক্ষমতা)। তাঁর গুণাবলিতে কোনো পরিবর্তন আসে না। পরিবর্তন ত্রুটি ইঙ্গিত করে। তাঁর কোনো ত্রুটি বা খুঁত নেই। যদিও সৃষ্টির মধ্য কোনো কিছুই তাঁর সাথে সদৃশ নয়, ইহজগতে তাঁকে জ্ঞান লাভ সম্ভব যতটুকু তিনি জানাতে চান এবং পরজগতে তাঁর দর্শন সম্ভব যেভাবে তিনি চান। ইহজগতে তিনি জ্ঞাত তিনি কেমন তা অনুধাবন করা ব্যতিরেকেই এবং পরজগতে তাঁর দর্শন লাভ হবে, তাও দুর্জ্ঞেয় উপায়ে। দয়া করে, 'মাকতুবাত' ১ম খণ্ডের ৪৬তম পুস্তিকাটি পড়ুন। 'মাকতুবাত' মশহুর ওয়ালী এবং আলিম ইমামে রাব্বানির (রহ.) মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমদ ফারুক সিরহিন্দী (র) লিখিত অতুলনীয় গ্রন্থ)। আল্লাহ তাআলা মানবের হেদায়তের উদ্দেশ্যে নবী ও রাসুল (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরণ করেন। এ মহান সত্তাগণের মাধ্যমে তিনি মানব জাতিকে দেখিয়েছেন কোন কাজ সুখ সমৃদ্ধি আনে এবং কোন কাজ ধ্বংস আনে। সর্বশ্রে নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। তিনি সকলের রাসুল হিসেবে প্রেরিত হচ্ছেন-হোক সে পুণ্যবান অথবা পাপী, প্রত্যেক স্থান এবং জগতের প্রত্যেক জাতির জন্য। তিনি সকল মানব, ফিরিশতা এবং জীনের জন্য নবী। জগতের প্রত্যেকটি স্থানে, প্রত্যেকেই তাঁকে অনুসরণ করতে হবে এবং এ সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের অনুকরণ করতে হবে।[৩৪]

সায়্যিদ আব্দুল হাকিম আরওয়াসি (র)[৩৫] বলেন-রাসুলুল্লাহ (দ.)র তিনটি কাজ ছিল। প্রথমটি ছিলো কুরআনুল করিমের জ্ঞান অর্থাৎ ইমান ও ফিকহী হুকুম আহকামের জ্ঞান মানুষের মাঝে তাবলিগ বা প্রচার করা। ফিকহী হুকুম আহকাম যেসব কাজ বৈধ এবং যেসব কাজ অবৈধ-তা নিয়ে গঠিত। জ্ঞানের এ দুই শাখাকে ইসলামি আহকাম বলে। তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিলো কুরআনের আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞানকে কেবলমাত্র উম্মাহর মধ্যে সর্বোচ মর্যাদার অধিকারীগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়া। তাঁর প্রথম কাজ তাবলীগকে তাঁর দ্বিতীয় কাজের সাথে গুলোয়ে ফেলা যাবে না। লা-মাযহাবীরা এ দ্বিতীয় কাজকে অস্বীকার করে। হযরত আবু হুরাইরা (র.) বলেন-আমি আল্লাহর রাসুল (দ.)র কাছে দুই প্রকারের জ্ঞান শিখেছি, তাদের মধ্যে একটি তোমাদের বর্ণনা করেছি। যদি দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করি, তবে তোমরা আমাকে খুন করবে। হযরত আবু হুরাইরা (র.) বর্ণিত হাদিসটি বুখারী, মিশক্বাত, হাদীক্বা এবং মাকতুবাতের ২৬৬ ও ২৬৭ নম্বর চিঠিতে বর্ণিত হচ্ছে (এই চিঠিদ্বয়ের বাংলা অনুবাদ পরের অধ্যায়ে পড়া যাবে)। তৃতীয় কাজ ছিলো যে সকল মুসলমান ফিকহী হুকুম-আহকাম পালন সংক্রান্ত উপদেশ ও আদেশ পালন করে নি-তাদের উদ্দেশ্যে। এমন কি প্রয়োজন অনুসারে ফিকহী আহকাম পালনে বাধ্য করা হচ্ছে।

রাসুলুল্লাহ (দ.)র পর চার খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকে এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। হযরত হাসান (দ.) র সময় ফিতনা ও বিদ'আহ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ইসলাম তিন মহাদেশজুড়ে ছড়িয়ে গেলো। রাসুলুল্লাহ (দ.)র জ্বালানো আলো যেন স্তিমিত হওয়া শুরু করলো। সাহাবিগণের সংখ্যাও কমতে লাগলো। ঐ তিন কাজে এক সাথে করতে পারার মতো কেউ রইলো না। সেজন্য ঐ তিন কাজের দায়িত্ব তিন দল ব্যক্তি বুঝে নিলেন। ইমান ও ফিকহী আহকাম প্রচার করার কাজ যাদের উপর ন্যাস্ত হয়েছিল তারা হলেন মুজতাহিদ। আবার তাদের মধ্যে যারা ইমান প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত তারা হলেন মুতাকাল্লিমুন আর যারা ফিকহ প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্তগণ হলেন ফুক্বাহা। দ্বিতীয় কাজ অর্থাৎ কুরআন করিমের রুহানী জ্ঞান আগ্রহী মুসলমানদের মাঝে পৌছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন আহলে বায়ত ও সিররি সাক্বত্বী (ওফাত -২৫১/৮৭৬,

---

[৩৪]. কিমিয়ায়ে সাআদাত, ইমাম গাজ্জালী (দ.). ইসলামের শ্রেতম বুযুর্গদের মধ্যে একজন। তিনি শত শত কিতাব রচনা করেন। তাঁর লিখিত প্রতিটি কিতাবই সীমাহীন মূল্যবান। তিনি ৪৫০ হিজরি মোতাবেক ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন তুস বর্তমানে ইরানের মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৫০৫ হিজরি মোতাবেক ১১১১ খ্রিস্টাব্দে ওফাত লাভ করেন।

[৩৫]. সায়্যিদ আব্দুল হাকিম আরওয়াসি ১২৮১ হিজরি মোতাবেক ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাশকাল'আতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৬২ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আঙ্কারায় ওফাতবরণ করেন।

বাগদাদ) ও জুনাইদ বাগদাদীর (জন্ম-২০৭ / ৮২১, ওফাত-২৯৭/৯১১ বাগদাদ) মতো তাসাউফের বুযুর্গের সমন্বয়ে বারো জন ইমাম। তৃতীয় কাজ শরিয়তের আইন কানুন বাধ্যবাধকতার সাথে বাস্তবায়নের দায়িত্ব সুলতান বা সরকারের উপর ন্যাস্ত হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর জ্ঞানের শাখাকে বলা হয়-মাযহাব, দ্বিতীয় শাখাকে তরিকা[৩৬] এবং তৃতীয়টিকে হুকুক (বিচার ব্যবস্থা) বলা হয়। মাযহাব-যা ইমান নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয়-ইতিক্বাদ বা আক্বিদার মাযহাব। আমাদের নবী (দ.) ইরশাদ করছেন-মুসলিমরা ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে এবং তার মধ্যে কেবল একটি দল সঠিক পথে থাকবে এবং বাকিরা পথভ্র।" এবং সত্যিই তাই হচ্ছে। যে দলকে সঠিক ইসলামের পথে থাকার সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে তা হলো-আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। বাকি যে ৭২ দলকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষণা করা হচ্ছে তারা হলো আহলুল বিদ'আহ-বা বাতিল ফিরকা। তাদের কেউই সাধারণত কাফির নয়। অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু কোনো মুসলিম যে এ বাকি ৭২ দলের যে কোনো একটির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত দাবি করে এবং কুরআন, হাদিস ও মুসলমানদের ইজমা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত কোনো বিষয় অর্থাৎ জরুরিয়্যাতে দ্বীন বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের কোনো একটিকে অস্বীকার করলে, সে কাফির সাব্যস্ত হবে। বর্তমানে এমনও লোক পাওয়া যাবে যাদের মুসলিম নাম আছে কিন্তু আহলুস সুন্নাহর মাযহাবের বিরোধিতা করে তারা কাফির বা অমুসলিমে পরিণত হচ্ছে। হযরত আব্দুল হাকিম এফেন্দির উদ্ধৃতি এখানেই শেষ।

একজন মুসলিমকে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করে যেতে হবে। মুসলিমদের যে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তাকে উলুমুল ইসলামিয়্যাহ বলা হয়, যার দুটি অংশ এক. উলুমুন নাক্বলিয়্যাহ, দুই. উলুমুল আক্বলিয়্যাহ।

এক. উলুমুন নাক্বলিয়্যাহ : একে ইলমে দ্বীন বলা হয়। এ জ্ঞান আহলে সুন্নাতের আলিমগণের গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত হয়। দ্বীন ইসলামের আলিমগণ এ জ্ঞানগুলো চারটি মূল উৎস থেকে আহরণ করেছেন। এ চারটি উৎসকে বলা হয়-আল আদিল্লাতুশ শরিয়াহ। এগুলো হলো কুরআনুল কারিম, হাদিস শরিফ, ইজমাউল উম্মাহ ও ক্বিয়াসুল ফুক্বাহা।

ইলমে দ্বীন বা দ্বীনী জ্ঞানের প্রধানত ৮টি শাখা

১. ইলমে তাফসীর-কুরআন শরিফ ব্যাখ্যা করার জ্ঞান। এ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞকে মুফাসসির বলা হয় যিনি খুবই গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং আল্লাহর কালামের উদ্দেশ্য বুঝতে সমর্থ।
২. ইলমে উসুলে হাদিস-এই শাখায় হাদিসের শ্রেণিবদ্ধকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। হাদিসের বিভিন্ন প্রকার এন্ডলেস ব্লিস গ্রন্থে বর্ণনা করা হচ্ছে।
৩. ইলমে হাদিস-এই শাখায় রাসুলুল্লাহ (দ.) র বাণী (হাদিস), কর্ম পদ্ধতি (সুন্নাহ) এবং অবস্থা (হাল) পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করা হয়।
৪. ৪.ইলমে উসুলে কালাম-এই শাখায় কুরআন ও হাদিস হতে ইলমে কালাম উদ্ভূত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে।
৫. ইলমে কালাম-এই শাখায় কালিমায়ে তাওহিদ, কালিমায়ে শাহাদাত এবং ইমানের ছয়টি মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এ জ্ঞানগুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে। ইলমে কালামের জ্ঞানীগণ ইলমে কালাম ও ইলমে উসুলে কালামকে একই সাথে বর্ণনা করেন। এ কারণে সাধারণ মানুষ এ দুই শাখাকে একটি বলে মানে।
৬. ইলমে উসুলে ফিকহ-এই শাখায় কুরআন ও হাদিস হতে ফিকহী মাসআলা বের করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে।
৭. ইলমে ফিকহ : এ শাখাটিতে আফআলে মুকাল্লাফিন অধ্যয়ন করা হয় যে, বিচক্ষণ এবং যুবসমাজের লোকেরা শরীর সম্পর্কিত বিষয়ে কীভাবে কাজ করবে বা করা উচিত সে বিষয়ে বলে। এটি এমন কতগুলো ইলম নিয়ে গঠিত যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়। আফআলে মুকাল্লাফানের আটটি বিভাগ রয়েছে : ১.ফরজ, ২.ওয়াজিব, ৩.

---

[৩৬]. ওলামায়ে আহলে সুন্নাত প্রিয়নবী (দ.)'র দ্বিতীয় কাজটি শিখেছেন বারজন ইমাম (র)র কাছ থেকে ইলমে তাসাউফ সংগ্রহ করার মাধ্যমে। কিছু লোক আছে যারা আউলিয়া, কারামত, তাসাউফে বিশ্বাস করে না। তার মানে তাদের সাথে বার জন ইমামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। যদি তারা আহলে বায়তকে অনুসরণ করতো, তারাও বারো ইমামের কাছে আল্লাহর রাসুলের ঐ দ্বিতীয় কাজ শিখতে পারতো এবং তাদের মাঝেও তাসাউফের আলেম ও আল্লাহর ওয়ালি পাওয়া যেতো। তাদের মাঝে এমন পাওয়াও যায় না এবং তারা এমন জ্ঞানে বিশ্বাসও করে না। নিঃসন্দেহে বারো জন ইমাম হলেন - আহলে সুন্নাতের ইমাম। আহলে সুন্নাতই আহলে বায়তকে ভালোবাসে এবং বারোজন ইমামকে অনুসরণ করে। একজন প্রকৃত ইসলামি শাস্ত্রজ্ঞ বা আলেম হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহর ঐ দুই কাজের উত্তরাধিকার থাকতে হবে অর্থাৎ জ্ঞানের ঐ দুই শাখায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে। তেমনই একজন আলিম আব্দুল গনি নাবলুসী (র) তাঁর কিতাব 'আল হাদিকাতুন নাদিয়াত' এর ২৩৩ ও ৬৪৯ পৃষ্ঠায় কুরআন শরিফের রুহানী জ্ঞান সম্পর্কিত হাদিস আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এই জ্ঞানের অস্বীকার অজ্ঞতা এবং প্রত্যাখ্যাত।

সুন্নাহ, ৪.মুস্তাহাব, ৫.মুবাহ, ৬. হারাম, ৭.মাকরুহ ও ৮.মুফসিদ। তবে এগুলোকে সংক্ষেপে তিনটি গ্রুপে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে :

ক. নির্দেশিত আমল,

খ. নিষিদ্ধ কাজ এবং

গ. অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ (মুবাহ)।

৮ ইলমে তাসাউফ : এ শাখাটিকে ইলমে আখলাক (নৈতিকতা)ও বলা হয়। এটি কেবল আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়েরই ব্যাখ্যা করে না বরং দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনে মুসলিমদেরকে ইলমে ফিকহ এর শেখানো বিষয়ে যথাযথ আমল এবং মারিফা অর্জনে সহায়তা করে। এ আটটি শাখার বাইরেও এগুলোর মধ্যে যতটুকু প্রয়োজন প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য কালাম, ফিকহ ও তাসাউফের জ্ঞানার্জন করা ফরজে আইন। আর না শেখাটা বড় পাপ, অপরাধ।[৩৭]

দুই. আল উলুমুল আকলিয়্যা (পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান) : এ বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত : প্রযুক্তিবিজ্ঞান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান। এগুলো শেখা মুসলমানদের পক্ষে ফরজে কিফায়া। ইসলামি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ফরজে আইন। ইসলামি বিজ্ঞানে বিজ্ঞ হতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শেখা ফরজে কেফায়া। যদি কোনো শহরে এমন হয় যে, এ জ্ঞানগুলো জানেন এমন আলেম একজনও নেই, তাহলে তার সমস্ত বাসিন্দা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ দায়ী হবে। ধর্মীয় শিক্ষাগুলো সময়ের আবর্তনে পরিবর্তিত হয় না। ইলমে কালাম নিয়ে মন্তব্য করার সময় ভুল বা ত্রুটি করা একটি সংবেদনশীল অসমর্থনযোগ্য অজুহাত। এটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। ফিকহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ইসলামের দেখানো বিভিন্নতা এবং সুযোগগুলো ব্যবহার করতে পারবে, যখন কারো মধ্যে ইসলামি ওজরগুলো পাওয়া যাবে। ব্যক্তিগত মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গিলসহ ধর্মীয় বিষয়গুলোতে বৈপরীত্য বা পুনর্বিন্যাস করা কখনো অনুমোদিত নয়। এটা ঈমানহানির কারণ হতে পারে। উলুমুল আক্বলিয়্যাতে পরিবর্তন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি বৈধ! এগুলোর অনুসন্ধান করে খুঁজে নিয়ে এমনকি অ-মুসলমানদের থেকে হলেও শিক্ষা গ্রহণ করে হলেও এ শিক্ষাতে উন্নতি করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত নিবন্ধটি আল-মাজমুআত আজ-জুহদিয়্যা বই থেকে উদ্ধৃত হচ্ছে। এটি সংকলন করেছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সাইয়েদ আহমেদ জাহদি পাশা (রহ.)। ফিকহ শব্দটি যখন ফকিহা ইয়াফকাগু' আকারে ব্যবহৃত হয়, এটির চতুর্থ পর্যায়ের অর্থ- জানা, বুঝা'। এটি যখন পঞ্চম বিভাগে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ জানা, ইসলামকে বুঝা। ইলমে ফিকহের একজন পণ্ডিতকে ফকিহ বলা হয়।

ইলমে ফিকহ লোকদের করণীয় ও বর্জনীয় সব কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে। ফিকহের জ্ঞান হলো কুরআনুল কারিম, হাদিস শরিফ, ইজমা আর ক্বিয়াস নিয়ে রচিত। সাহাবায়ে কিরাম ও মুজতাহিদগনের ঐক্যকে (যারা তাদের পরে এসেছিলেন তাদেরকে) ইজমাউল উম্মা বলা হয়। ধর্মীয় নীতিগুলো যেসব কুরআনুল কারিম, হাদিস শরিফ এবং ইজমায়ে উম্মা থেকে নিষ্পন্ন হচ্ছে তাদেরকে কিয়াস আল-ফুকাহ বলা হয়। কোনও কাজ হালাল (অনুমোদিত) কি হারাম (নিষিদ্ধ) যখন তা কুরআনুল কারিম বা হাদিস শরিফ থেকে বোঝা যায় না, তখন এ কাজকে পরিচিত অন্যটির সাথে তুলনা করা হয়, এ উপমাটিকে কিয়াস বলা হয়। ক্বিয়াস প্রয়োগ করতে আধুনিক বিধানের সেই ফ্যাক্টর থাকা প্রয়োজন যা আগের/পুরোনো বিধানকে বৈধ বা অবৈধ করেছে। এবং এটি ঐ সমস্ত বিজ্ঞ জনেরাই ফয়সালা করতে পারেন যাঁদের ইজতিহাদের গভীপাণ্ডিত্য রয়েছে। ইলমে ফিকহের বিস্তৃতি সুদূরপ্রসারি। এর চারটি প্রধান বিভাগ রয়েছে :

১) ইবাদত : এটি পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত : সালাত (নামাজ), সাওম (উপবাস), যাকাত, হজ্জ, জিহাদ। এ প্রতিটি অংশ আবার একেকটি বিভাগে গঠিত। যেমন দেখা যায়, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াও এক ধরনের ইবাদতের কাজ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সে কথাই বলেন,। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ দুই প্রকার : ক) কাজের/পরিশ্রমের মাধ্যমে জিহাদ এবং খ) শব্দ দ্বারা জিহাদ। কর্মের মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার শেখা ফরজ। জিহাদ রাষ্ট্রের দ্বারা করা হয়। মানুষ জিহাদ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের আইন ও আদেশ মেনে চলে জিহাদে যোগ দিতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশনার মাধ্যমে শত্রুদের আক্রমণ, গতি চিত্র, রেডিও সম্প্রচার এভাবে প্রতিটি মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা প্রচার করে দ্বিতীয় এক প্রকার যুদ্ধ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাছে; সুতরাং এ ক্ষেত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোও এক প্রকার জিহাদ।

---

[৩৭]. আল-হাদিকা, পৃা ৩২৩ এবং রদ্দে মুহতারের উপস্থাপনায়।

২) মুনকিহাতঃ বিবাহের মতো বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত বিবাহবিচ্ছেদ, খোরপোষ এবং আরও অনেককিছু [আরো বিস্তারিত, আলাদাভাবে লেখা ছয়গুচ্ছের ENDLESS BLISS এ দয়া করে পঞ্চম গুচ্ছের দ্বাদশ অধ্যায় এবং ষষ্ঠ গুচ্ছের পঞ্চদশ অধ্যায় খুেন]।

৩) মুআমালাতঃ এটি অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। কেনা, বেচা, ভাড়া, যৌথ-মালিকানা, সুদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি। (দয়া করে ENDLESS BLISS বইয়ের ষ অধ্যায়ের শেষ চারটি অনুচ্ছেদ দেখুন, চতুর্থগুচ্ছ এবং পঞ্চমগুচ্ছের শেষ উনিশ অধ্যায়ও দেখুন)

৪) উকুবাত তথা দণ্ডবিধিঃ এটি পাঁচটি প্রধান বিষয় নিয়ে গঠিত। কিসাস (প্রতিশোধের নিয়ম), সিরকাত (চুরি), যেনা (ব্যভিচার), ক্বাদাফ (পুণ্যবান সতীসাধ্বী মহিলাকে অনিয়মের অভিযোগে আনা) এবং রিদ্দা (মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে)। (দয়া করে ঊঘউখঊঝঝ ইখওঝঝ বইয়ের ষ গুচ্ছের দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়টি দেখুন।)

ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত ফিকহের পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। মুনকিহাত আর মুআমালাতের জ্ঞানার্জন করা ফরজে কিফায়া। অন্য কথায়, এ দুটি বিজ্ঞান প্রয়োজনমতো অবশ্যই শিখতে হবে। ইলমে তাফসির, ইলমে হাদিস এবং ইলমে কালামের পর সর্বাধিক সম্মানিত ইলম বা জ্ঞান হলো ইলমে ফিকাহ। নিম্নলিখিত ছয়টি হাদিস হবে ফিকাহ ও ফকিহর (রহ.) মর্যাদা নির্দেশ করার পক্ষে যথেষ্ট :

১। যদি আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোনো বান্দাকে তাঁর নেয়ামত দান করতে চান, তিনি তাঁকে একজন ফকিহ (দ্বীনের গভীর জ্ঞানী) বানিয়ে দেন।

২। যদি কোনো ব্যক্তি ফকিহ হয়, তবে আল্লাহু তা'লা অপ্রত্যাশিত উৎসের মাধ্যমে তাঁর ইছা এবং তাঁর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দেন।

৩। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার মধ্যে দ্বীনি জ্ঞান (ইলমে ফিকহ) রয়েছে।

৪। শয়তানের বিরুদ্ধে, একজন ফকিহ এক হাজার আবেদের (যারা বেশি ইবাদাত করে) চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

৫। সবকিছুরই ভিত্তি তৈরির জন্য একটি স্তম্ভ রয়েছে। ধর্মের মূল স্তম্ভ হচ্ছে ফিকহের জ্ঞান।

৬। সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক মূল্যবান ইবাদত হলো ফিকহের জ্ঞান শেখা ও শিক্ষা দেওয়া।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) এর শ্রেষ্ঠত্বও এ হাদিস শরিফগুলো থেকেই অনুমিত। হানাফি মাযহাবের ইসলামি শিক্ষাগুলো সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুউদ' (র.)-দিয়ে শুরু হচ্ছে একটি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে। বলার অপেক্ষা রাখে যে, হানাফি মাযহাবের প্রতিতা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহের জ্ঞানার্জন করেছিলেন তার উস্তাদ হাম্মাদ থেকে, হাম্মাদ ইব্রাহিম আন নাকিজি থেকে, ইব্রাহিম আন নাকিজি শিক্ষার্জন করেছিলেন আলক্বামা থেকে, আর আলক্বামা (র.) শিক্ষা গ্রহন করেছেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) থেকে, যিনি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আবু ইউসুফ , ইমাম মুহাম্মদ আশ-শাইবানী, জুফার ইবনে হুদাইল এবং হাসান ইবনে জিয়াদ রহিমাহুল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইমামে আযমের শিষ্য ছিলেন। উনাদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইসলামিক শিক্ষার উপর প্রায় এক হাজার বই রচনা করেন। যিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৯ খ্রিস্টাব্দে (৮০৫ হিজরি) ইরানের রায়েতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীর (বিধবা) মায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একজন শিষ্য তাঁর সমস্ত বই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) নিজেই বলেন, আমি শপথ করে বলছি যে, আমার ফিকহের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে ইমাম মুহাম্মদের বইগুলো পড়ে। যারা ফিকহের জ্ঞান আরও গভীর করতে চায় তাদের উচিত আবু হানিফার (রহ.) মতানুসারী হওয়া। একবার তিনি বলেন, : সমস্ত মুসলমান ইমাম আজম (রহ.) এর একই পরিবারের সন্তানদের মতো। অন্য কথায়, একজন পুরুষ তার স্ত্রী সন্তানদের জন্য যেমন জীবিকা নির্বাহ করেন ইমামে আজমও তাদের (অনুসারীদের) প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য নিজের উপর সেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের প্রচুর পরিশ্রম থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহের জ্ঞানকে সংকলন করেছেন , তিনি এটিকে শাখা এবং উপশাখায় শ্রেণিবদ্ধ করে এটির জন্য নীতিমালা নির্ধারণ করে দেন। এছাড়াও, তিনি রসুলুল্লাহ (দ.) ও সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু আলাইহিম আজমাইনদের প্রচারিত শিক্ষা সংগ্রহ করে তা তাঁর শত শত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর কতিপয় শিষ্য ইলমে কালামে বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন ঈমানের শিক্ষায়। তাঁদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ আশ-শাইবানির একজন শিষ্য আবু বকর আল-জুরজানি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এবং আবু নসর আল-আইয়াদ, তাঁর (আবু বকর আল জুরজানির) অন্যতম একজন ছাত্র, তিনি আবু মনসুর আল-মাতুরিদিকে ইলমে কালামে শিক্ষিত করে

তোলেন। আবু মনসুর তাঁর বইগুলোতে লিখেছিলেন কালামের শিক্ষা যেহেতু তারা ইমামে আজম (রহ.) থেকে পেয়েছেন। ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করে, তাই তিনি সেগুলোকে আহলে সুন্নাহর ইতিকাদের উপর একীভূত করে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন অনেক দূর-দূরান্তে। তিনি ৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে (৯৪৪ হিজরি) তে সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন। এ মহান পণ্ডিত এবং আরেকজন পণ্ডিত আবুল হাসান আল আশআরিকে সুন্নী ইতিকাদের মাযহাবদের ইমাম বলা হয়। ফিকাহের আলেমদের সাতটি গ্রুপে ভাগ করা হচ্ছে। কামাল পাশাজাদা আহমাদ ইবনে সুলাইমান এফেন্দি (রহ.) তাঁর রচনায় ওয়াকফ আন-নিয়্যত এ সাতটি গ্রেডকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন–

১. ইসলামের মুজতাহিদগণ : যারা ধর্মের চারটি উৎস থেকে গৃহিত সমস্যা সমূহের নিয়ম-নীতিসমূহ বিনির্মাণ করেছিলেন (আদিল্যায়ে আরবা/চারটি দলিল), এবং সে অনুসারে নীতিমালাগুলোকে তারা প্রতিতি করেছেন। এ পণ্ডিতগণ হলেন-
২. আইয়িম্যায়ে আল মাযাহিব (অর্থাৎ, ইমামে আজম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইসলামের এ চারজন বিশ্বস্ত ও সঠিক নেতাদের মাযহাবের অনুশীলন করা হয়।)[৩৮] মাযহাবের মুজতাহিদগণঃ যারা চার মাযহাব অনুসৃত নীতিমালা থেকে নিয়মনীতি নিরুপণ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইমাম ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)।
৩. মাসয়ালার ব্যাপারের মুজতাহিদগণ : এমন সব মাসয়ালা যা পূর্বে ইমামগণ কর্তৃক নিরুপিত হয়নি। এসব ব্যাপারে তাঁরা ইমামদের অনুসরণ করে থাকেন। উনাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইন খার্খী, শামসুল আয়েম্মাহ আল-হাওয়ানী, কাদী খান হাসান ইবনে মনসুর আল ফারগানী (রহ.) প্রমুখ।
৪. আসহাবুত তাখরীজ : উনারা ইজতিহাদের ব্যাপারে স্বীকৃত নন। এমন সব বিজ্ঞ এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত যারা মুজতাহিদদের নিরুপিত বিষয়াদি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেন। যেমন– হাসান আদদ্বীন আল রাযী (রহ.)।
৫. আরবাবুত তারজীহ : যারা মুজতাহিদগণের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে একটিকে পছন্দ করে নিয়েছেন। এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন আবুল হাসান আল কুদুরী এবং হিদায়া গ্রন্থের লেখক বুরহান উদ্দীন আলি আল মারগিনানী-যিনি চেঙ্গিস খানের বাহিনীর হাতে ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে শহিদ হন।
৬. মুকাল্লিক : যারা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মাসয়ালা লিখেছেন এবং নিজেদের গ্রন্থে কোন মাসয়ালার বিরুদ্ধাচরণ করেননি। কানযুদ দাকায়েক এর সম্মানিত লেখক আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আন নাসাফী (রহ.) এদের মধ্যে অন্যতম।
৭. এই শ্রেণিও মুকাল্লিদের[৩৯] অন্তর্গত : যারা আসল এবং নকল মাসয়ালার পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম।

মাযহাবহীন কোন ব্যাক্তিই নিজের জন্য সুপথ পায়নি খুঁজে;
যদিও সে সকলের অনুকরণ করে, তবুও সে সঠিক নয়।
তোমার (প্রভু) করুণা কাম্য আমার-আমি যে অজ্ঞ ভীষণ;
তোমার তরে কঠিন কী আর খোদা, তুমি দারুণ সদাশয়।
তোমার করুণা পাপীর তরে-আমিও যে বড্ড পাপী;
আমি কী করে আমার কৃতকর্ম করি অস্বীকার! তুমি যে সর্বজ্ঞ।
মলিন চেহারায় আমি-শৃঙ্খলিত, নিজেকেই নিয়েছি টেনে (পাপে)।
তোমার করুণা কাম্য আমার-আমি যে অজ্ঞ ভীষণ;
তোমার তরে কঠিন কী আর খোদা, তুমি দারুণ সদাশয়।
সমস্ত মানবকূল পতিত, তুমিই তো কেবল সত্য প্রভু।
তুমি ব্যতীত আর যে কেউ নেই ইবাদতের অধিকারী।
সর্বহারা দাসেদের আছে কী করার তুমিই মহান।

---

[৩৮]. এটি ছাড়াও এই সম্মানিত চার মাযাহাবকে যথাক্রমে, হানাফী, মালেকি, শাফেয়ী এবং হাম্বলি মাযহাব বলা হয়।

[৩৯]. এই লোকেরা ফিকাহ পণ্ডিতদের মধ্যে গণ্য হতো, কারণ তারা কী পড়ে তা বুঝতে পারতো এবং মুকাল্লিদের মতো যারা বুঝতে পারে না তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

প্রথম খণ্ডের ২৬৭তম চিঠি

চিঠিটি হুসাম আদ দ্বীন আহমেদ (রহ.) এর জন্য লেখা :
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। সালাত এবং সালাম আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এবং তাঁর পরিবার পরিজনের উপর। আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত যা আপনি এ ফকিরের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ চিঠির বরকতে আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আল্লাহ প্রদত্ত কোন রহমতের কথা আমি লিখব! আমি কিভাবে এসবের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি! আল্লাহ প্রদত্ত আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার নিমিত্তে জ্ঞানে ও মারেফতের যে নিগুঢ় বিষয় তা লিখা হচ্ছে। এবং তা পঠিত জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সকলের মাধ্যমে। যাই হোক, এসব জ্ঞানতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পেতে পারেনা। বস্তুর এসব বিষয়ে কিছুই বলা সম্ভব নয় -না চিঠিতে, না কোন ভাবেই। এমনকি আমার সন্তান-যে মারেফতের পরিপক্বতা অর্জন করেছেন, তিনিও এসব তত্ত্বের উচমার্গের অবস্থানের বিষয়ে কিছুই বলতে পারবেনা যা তিনি অর্জন করেছেন। এর মধ্যে এমন এক পর্যায় যা সুলুক এবং জযবা হ্যাঁ এটি অবশ্যই ওসব রহস্য লুকায়িত রাখার জন্য।
আমি জানি, আমার রহমতপ্রাপ্ত সন্তান জ্ঞানের এসব নিগূঢ় রহস্য অর্জন করেছেন এবং ভুল ও দ্বিধা থেকে সংরক্ষিত। যেহেতু এসব রহস্য-তাই আমিও বাকরুদ্ধ। এসব রহস্য আমাকে মুখ খোলা থেকে প্রতিহত করে। সুরা শু'আরায় বর্ণিত আয়াত দ্বারা আমার অবস্থার উদাহারণ দিছি : আমার হৃদয় সঙ্কুচিত, আমার কথামালা অচল (আয়াত-১৩)।
সমস্ত কল্যাণ (মারেফত), যা আমরা গোপনে সচেষ্ট, নবুওয়াত থেকেই আগত। এবং যা পালাক্রমে নবী (স.) এর মালিকানাধীন। এবং উচ পর্যায়ের ফিরিশতাদেরও এ কল্যাণে অংশ রয়েছে। এ কল্যাণের জন্য তারাই নির্বাচিত-যারা নবী (দ.) এর অনুসৃত পথ মেনে চলেন এবং সম্মান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (র.) বলেনঃ আমি নবী (দ.) এর কাছ দুরকম জ্ঞান অর্জন করেছি। প্রথমটি সম্পর্কে তোমাদের আগেই বলেছি, এবং দ্বিতীয় জ্ঞান সম্পর্কে তোমাদের বললে তোমরা আমাকে হত্যা করবে।
এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হলো রহস্য। সকলে এটি বুঝতে পারেনা। আল্লাহ তা'য়ালা তার পছন্দজনকেই এ জ্ঞান দান করেন। নিচের চিঠির দিকে নজর দিন যা আমার এক সম্মানিত শিক্ষকের সন্তানের কাছে লিখা হয়েছিলঃ
সম্মানিত শিক্ষক, এ ফকির (ইমাম রাব্বানির (রহ.) এর মতামত , তাসাউউফে বিদ'আত[৪০] ইসলামের বিধানে বিদায়াতের চেয়ে কম কুৎসিত নয়।
যখন তাসাউউফে কোন অদলবদল হয়, তখন বরকত ক্রমে বন্ধ হচ্ছে যায়। তাই তাসাউউফে যেন পরিবর্তন না হয় সে ব্যাপারে খুব যত্নশীল হওয়া উচিত। যদি কেউ তাসাউউফে ভিন্নতা আনার চেষ্টা করে তবে তাকে বাঁধা দিতে হবে- প্রয়োজনে জোরপূর্বকভাবে। সত্য এবং যথার্থ পথই প্রচার হতে হবে।
নিরাপদ এবং সম্মানের সাথে (প্রার্থনায় শেষ করছি)।

---

[৪০]. এমন কিছু যা ইসলামের প্রাথমিক মুসলমানদের সময় জাতিগত প্রথা বা অনুশীলনগুলিতে বা আধ্যাত্মিক আচরণে বিদ্যমান ছিল না এবং যা পরে ইসলামে সংযুক্ত করা হয়েছিল তাকে বিদআত বলা হয়। সমস্ত বিদআত খারাপ এবং কুৎসিত।

প্রথম খণ্ডের ২৬৮ তম চিঠি

এই চিঠিখানা খানান এর কাছে লিখিত। এইখানে উল্লেখ করা হচ্ছে বিজ্ঞরা নবীর উত্তরসূরী এবং জ্ঞানের গোপন অংশ কী : প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এবং নবী (দ.) এর উপর সালাত ও সালাম। আমি আপনার সুস্বাস্থ্যসহ নিরাপত্তা কামনা করছি। আমাদের লক্ষ্য জ্ঞানের মূল উত্তরসূরী নিরূপণ করা। আমার হাতে থাকা সময়ের সর্বোচ ব্যবহারের মাধ্যমে আমি এ ব্যাপারে কিছু কথা লিখছি। হাদিস শরীফে বর্ণিত : জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরসূরী।
নবী (দ.) এর প্রদানকৃত দুই প্রকারের জ্ঞান রয়েছে।
১. শরীয়তের জ্ঞান
২. গুপ্ত জ্ঞান
নবীর উত্তরসূরীপ্রাপ্ত জ্ঞানী সকল এ উভয় জ্ঞানের অধিকারী। যিনি কেবল একটি মাত্র জ্ঞানের অধিকারী তিনি উত্তরাধিকারী নন। উত্তরাধিকারীগণ উভয় জ্ঞানের অংশপ্রাপ্ত। যিনি কেবল এক প্রকারের জ্ঞান অংশ প্রাপ্ত হচ্ছেন তিনি উত্তরাধিকারী নন, বরং ঋতদাতা। ঋতদাতা কেবল তার অংশটুকুই পান। নবী (দ.) হতে বর্ণিত : আমার উম্মতের মধ্যে জ্ঞানীরা বনী ঈসরাইলের নবীদের সমতুল্য।
উত্তরাধীকারী প্রাপ্ত নন এমন কেউ পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নন, তারা কেবল নির্দিষ্ট একটি জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। যেমন– ফিকহ বিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতরাং বলা চলে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত, যিনি উভয় প্রকার জ্ঞানের অংশপ্রাপ্ত। অনেকেই ইলমে ইসরার কে তাওহীদে ওজুদীর জ্ঞান হিসেবে ব্যাখা করে থাকেন। তারা বলেন, এ জ্ঞান সালিকগণ কর্তৃক হাল অবস্থায় অনুভূত হয়। হাল্ হলো-ইহাতা (আত্মসমর্পণ), কুরব্ (নৈকট্য), মাইয়াত (সংযুক্তি)। কিন্তু বস্তুত এমনটি নয়। এ সমস্ত জ্ঞান গুপ্তজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং এসমস্ত নবুওয়াত পদমর্যাদার সমতুল্যও নয়। এসব জ্ঞান তাসাউউফের পরম মুহূর্তে অর্জিত হয় যা চৈতন্য অবস্থায় অর্জিত জ্ঞান নয়। বস্তুত নবীর অধিকৃত জ্ঞান হলো ইসলামি আইনে সংযুক্ত এমন গোপন জ্ঞান যা চৈতন্য জ্ঞান। এমন জ্ঞান কখনো অচৈতন্য জ্ঞানের সাথে মিশ্রিত নয়। তাসাউফের পরমানন্দ মুহূর্তে প্রাপ্ত জ্ঞান বেলায়াতের অংশ হতে পারে নবুওয়তের নয়। বেলায়াত যদিও নবীদের সংযুক্ত বিষয় তবুও বেলায়াত এবং নবুয়তের মধ্যে তুলনা চলেনা। ফার্সি বয়াতের বঙ্গানুবাদঃ
সূর্য উদিত হয়, পুরো পৃথিবীকে উজালা করে।
শুকতারা দীর্ঘক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায়না কখনো।
এইসমস্ত বিষয় আমি আমার বই এবং চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছি। নবুওয়াতের জ্ঞান হলো সমুদ্রের অনুরূপ, অন্যদিকে বেলায়াত সেই সমুদ্রের ফোটার সমতুল্য। যে সমস্ত ব্যক্তিরা বলে থাকেন বেলায়াত নবুয়ত থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তাদের কথা ভিত্তিহীন, যেহেতু তারা নবুয়াতের পদমর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অনেকেই এ দাবি করেন যে : নবীগণের বেলায়াত তাদের নবুয়তের চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কিন্তু তারা নবুয়ত কী ছিল তা বুঝতে পারেন না। একই কথা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা বলেন, সাকার এর অবস্থা (চৈতন্যহীন) এবং অন্যমনস্ক অবস্থা) কে সাহুর অবস্থার (প্রশান্ত অবস্থা) তুলনায় শ্রেয় মনে করেন।
একটি ফার্সি প্রবাদে আছে-পবিত্রতার জগতে মাটির সমতূল্য আর কি হতে পারে?
তাদের সাকারকে সাহুর তুলনায় শ্রেয় মনে করা-মর্যাদাবানদের সাহু ও অজ্ঞ লোকদের সাহুকে সমান মনে করার ফসল। অজ্ঞ ও মর্যাদাবানদের সাকারকে সমান মনে করার বিনিময়েও যদি তারা এ ধরণের কথা থেকে বিরত থাকতো, তবে খুব ভালো হতো। কারণ, যে কোনো বিজ্ঞ লোকই জানেন যে নিশ্চিতরূপে সাহু (প্রশান্ত ভাব) সাকার (চৈতন্যহীনতা) থেকে উত্তম। একই ব্যাপার ঘটে অজ্ঞদের সাহু এবং মর্যাদানবানদের সাহুর ক্ষেত্রে। বেলায়তকে নবুওয়তের চেয়ে উত্তম মনে করা এবং সাকারকে সাহুর চেয়ে উত্তম মনে করা-কুফরকে ইসলামের চেয়ে উত্তম মনে করার শামিল। কারণ, কুফর ও অজ্ঞতা বেলায়তের সমতূল্য, অন্যদিকে নবুয়তে ইসলাম ও মারিফত বিদ্যমান থাকে। মানসুর হাল্লাজ আরবি এ দুই পংক্তি বর্ণনা করেন, যার ববঙ্গানুবাদ -
আমি আল্লাহর দ্বীনে বিশ্বাস করি না, কুফর অবশ্যই দরকার
এটাই সত্য, যদিও মুসলমানরা তা পছন্দ নাই করুক।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফরি থেকে বেঁচে ছিলেন এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছেন। সুরা বনী ইসরাইলের ৮৪ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে-তাদেরকে বলুন-প্রত্যেকেই আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে। এটা জেনে রাখা দরকার, ইসলাম ধর্মে ইসলাম কুফরের তুলনায় উত্তম, একইভাবে হাকিকতেও (ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি) ইসলাম কুফরের চেয়ে উত্তম।
কারণ, ইসলামই বাহ্যিক হক্কাকতের উপস্থিতি।
প্রশ্ন : যেখানে কুফর (অবিশ্বাস), জাহেল (অজ্ঞতা) এবং সেকর উলিউয়াত জেম নামক গ্রেডে এর (উচতর) গ্রেড রয়েছে সেখানে ইসলাম, সহিহ এবং মারিফাত বলা হয়। তারপর, কিসের চিন্তা আমাদের কুফর, সেকার এবং জাহেল এর একের বলার মূল্যায়ন করা উচিত ?
উত্তর : সাহ ও অন্যান্য শ্রেণিগুলিকে ফারাক বলা হয়
সাহু এবং তাই সাথে ঘন সেকার সঙ্গে তুলনা গ্রেডকে জেম বলে অভিহিত করা হয়। সাহ এবং সেকার সেখানে একত্রিত হচ্ছে। ইসলাম এবং কুফরও এ গ্রেডগুলিতে একত্রিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে, মারেফাত ছাড়াও লধযষ (অজ্ঞতা) দিয়ে সংযুক্তি করা হচ্ছে।
যদি লিখা সম্ভব হতো, আমি এর দীর্ঘ দীর্ঘ সংজ্ঞা প্রদান করতাম যা ফারাক নামে পরিচিত গ্রেডগুলিতে রাজ্য এবং মারেফাত এবং ততক্ষণে বর্ণিত সেকার এবং এর মতো অন্যান্যরা কীভাবে সেই গ্রেডগুলিতে অন্যকে ঘৃণা করেছে তা নির্ণয় করা যেতো। যথেষ্ট যত্ন সহকারে বিবেচনা মানুষকে আগ্রহী করে তুলবে বিষয়টি বুদ্ধির সহিত পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য। এটি অবাক করার বিষয়, না, অত্যন্ত অবাক করার, সত্যিই! এটি বলা যথেষ্ট যে, নবীগণ (আ.) সেসব অর্জন করেছে যা নবুওয়াতের পথে তাদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, বেলায়তের পথে নয়!
বেলায়ত নবুয়তের অংশ বৈ কিছুই নয়। যদি বেলায়তই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হতো, তবে সর্বপ্রধান ফেরেশতা, যাঁর বেলায়ত সবার চেয়ে বেশি, তিনি নবুয়ত থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হতেন, (বস্তুত যা নয়) এবং যারা বলে বেলায়ত নবুয়ত থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, তাদের মনে ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বোচজন নবীগণ হতে শ্রে।" তাদের এ চিন্তা আহলে সুন্নাতের চিন্তা থেকে অনেক বেশি তফাতে। যারা এমন মন্তব্য করে তারা নবুয়ত কী সে ব্যাপারে অজ্ঞ। যেহেতু নবুয়তের সেই সময়টা অতীতের গভীর অতলে অবহেলিত হচ্ছে, তাই সকলের ধারণা নবুয়ত বেলায়তের তুলনায় নগন্য। তাই আমাকে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে হচ্ছে।
হে প্রভু! আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করো, আমাদের পদাঙ্ক যেনো সঠিক পথে চলে, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে সাহায্য করো। আমিন

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)

কামুস আল-আলম বইটিতে আছে, ইমাম আজম আবু হানিফার নাম ছিল নু'মান। তাঁর বাবার নাম ছিল সাবিত, এবং তাঁর দাদার নামও নু'মান ছিল। তিনি আহলুস সুন্নাহ এর ৪ জন ইমামের মধ্যে প্রথম। ইমাম অর্থ গভীর জ্ঞানের পণ্ডিত। তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রচারিত দীপ্তিমান ধর্মের একজন পথপ্রদর্শক। তিনি পারস্যের বিখ্যাত বংশের লোক ছিলেন।

তাঁর দাদা ইসলামকে মনে প্রাণে আকড়ে ধরেছিলেন। তিনি ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ে আনাস বিন মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা, সাহল ইবনে সাদ আস সাইয়্যিদি এবং আবু আল ফাদি আমির ইবনে ওয়াসিলা (রা.) দেরকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ইলমুল ফিকহর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাঈমানের কাছ থেকে।

তিনি বিখ্যাত তাবেয়ীনদের এবং ইমাম জাফর আস সাদিক (রহ.) এর সাহচর্য্য পেয়েছিলেন। তিনি অসংখ্য হাদিস মুখস্থ করেছিলেন। তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন একজন বিচারক হওয়ার জন্যে কিন্তু তিনি মাযহাবের ইমাম হন। তিনি বিশেষ এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অতি কম সময়ে তিনি ইলমুল ফিকহতে অনেক বেশি পান্ডিত্য লাভ করেন এবং সারাবিশ্বে তিনি বিখ্যাত হচ্ছে যান।

ইয়াযিদ ইবনে আমর, মারওয়ান ইবেন মুহাম্মদের আমলে যিনি ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন, যিনি ১৪তম এবং শেষ উমাইয়া খলিফা ছিলেন, যিনি মারওয়ান ইবনে হাকাম (রহ.), এবং যিনি মিশরের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার ৫ বছর পরে ১৩২ হিজরিতে হত্যাকৃত হয়েছিলেন, ইমামে আজমকে কুফার আইন-আদালতের বিচারক হওয়ার আহ্বান জানাই। যেহেতু ইমামে আজমের যথে তাকওয়া, জ্ঞান এবং বুদ্ধি ছিল, তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মানুষের দুর্বলতার কারণে মানবাধিকার রক্ষা করতে না পারার ভয়ে থাকতেন। ইয়াযিদ ইমামে আজমকে তাঁর মাথায় ১১০ বার বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেয়। ইমামে আজমের পবিত্র চেহারা মোবারক এবং মাথা ভাবলেশহীন হচ্ছে যায়। এর পরের দিন ইয়াযিদ তার দেওয়া প্রস্তাব উচারণ করে করে ইমামে আজমকে অত্যাচার করতে থাকে। ইমামে আজম বললেন, আমাকে পরামর্শ করার অনুমতি দেওয়া হোক। অনুমতি পেয়ে তিনি পবিত্র নগরী মক্কায় চলে যান এবং সেখানে ৫-৬ বছর অবস্থান করেন।

আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর মনসুর (রহ.) ইমামে আজমকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান হওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে এবং এর জন্যে তাকে কারাবরণ করতে হয়। তাঁকে বেত্রাঘাত করার এবং প্রত্যেক দিন ১০ বার বেশি আঘাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যখন বেত্রাঘাতের পরিমাণ ১০০তে পৌঁছাই তখন তিনি শহীদের মৃত্যু লাভ করেন। আবু সাদ মুহাম্মদ ইবনে মনসুর আল হারিজমি (রহ.) যিনি মালিক শাহ এর অন্যতম উজির (যিনি তৃতীয় সেলজুকি সুলতান এবং যিনি সুলতান আলপারস্লান এর পুত্র), ইমামে আজমের রওজা মোবারকের উপরে সুন্দর একটি গম্বুজ তৈরী করেছিলেন। পরবর্তীকালে অটোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটেরা অনেকবার উনার রওজাকে সুশোভিত এবং সংস্কার করেছিলেন।

ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) প্রথম ইলমুল ফিকহের সংকলন এবং শ্রেণীকরণ করেছিলেন, এবং জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার জন্যে তথ্যসমূহ একত্রিত করেছিলেন। তিনি ফারায়েজ এবং শুরুত দুটি কিতাব লিখেছেন। তাঁর অসংখ্য কিতাব তার জ্ঞানের বিশালতা, কিয়াসে তার অসাধারণ ক্ষমতা এবং তাঁর হতবাক করার মত তাকওয়া, নম্রতা, এবং ন্যায়পরায়নতায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করে।

অটোমান সাম্রাজ্যের সময়ে হানাফি মাযহাব দিগদিগন্তে পৌঁছে যায়। হানাফি মাযহাব প্রায় রাষ্ট্রীয় মাযহাবে পরিণত হয়। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ এবং আহলে সুন্নাহর অধিকাংশ অনুসারী হানাফি মাযহাব অনুসারে ইবাদত বন্দেগী করে থাকে। কামুসুল ইসলাম হতে দৃষ্টান্তরুপ উল্লেখ এখানে শেষ।

মিরাতুল-কাইনাত বইটি বর্ণনা করেঃ ইমামে আজম (রহ.) এর পূর্বপুরুষগণ ইরানের ফারিস অঞ্চল হতে এসেছেন। ইমামে আজমের পিতা ছাবিত হযরত আলী (র.) এর সাথে কুফায় সাক্ষাত করেছিলেন। তখন হযরত আলী (র.) তাঁর এবং তার বংশধরদের জন্যে দোয়া করেছিলেন। ইমাম আজম (রহ.) তাবেয়ীনদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি আনাস বিন মালেক (র.) কে দেখেছিলেন এবং আরো ৩ অথবা ৭ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। ইমাম আজম সাহাবীদের কাছ থেকে হাদিস শরীফের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

একটি হাদিস শরীফ, যেটি ইমাম হারিজমী হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণনা করেছিলেন মুত্তাসিল সনদে (যেই হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে নিরবিছিন্নতা রয়েছে), বর্ণনা করে, "আমার উম্মতের মধ্যে একজন লোক আসবে, তার নাম হবে আবু হানিফা। বড় হচ্ছে সে আমার উম্মতের জন্যে আলোর উৎস হবে।" আরেকটি হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, "একজন পুরুষ যার নাম নুমান ইবনে সাবিত এবং তাকে ডাকা হবে আবু হানিফা নামে, তার আবির্ভাব হবে এবং আল্লাহর দ্বীন ও আমার সুন্নাহ কে পুনরায় জীবিত করবে।" আরো একটি হাদিসে বর্ণনা করা হচ্ছে, "প্রত্যেক শতাব্দীতে আমার উম্মতেরা একজন পন্ডিতের সাক্ষাত পাবে, আবু হানিফা হবে তাঁর সময়ের পণ্ডিত।" এ তিনটি হাদিস মাউজুয়াতুল উলুম এবং দারুল মুখতার বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এ হাদিসটি আরো বেশি প্রসিদ্ধ, "আমার উম্মতের মধ্যে আবু হানিফা নামের এক লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর দুই কাঁধের হাড়ের মাঝখানে একটি সুন্দর চিহ্ন থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামকে তাঁর দ্বারা পুনর্জীবিত করবেন।"

দারুল মুখতার এর ভূমিকায় লেখাঃ একটি হাদিস শরীফে বর্ণনা করে, "হযরত আদম (আ.) যেমন আমাকে নিয়ে গর্ব করত, আমিও আমার উম্মতের মধ্যে নুমান নামের একজন পুরুষকে নিয়ে গর্ব করি যাকে আবু হানিফা বলে ডাকা হবে। সে আমার উম্মতের জন্যে আলোর উৎস হচ্ছে উঠবে।" অন্য হাদিস শরীফ বর্ণনা করে, "নবীগণ আমাকে নিয়ে অহংকার করত এবং আমি আবু হানিফা কে নিয়ে অহংকার করি। যে তাকে ভালোবাসবে সে আমাকে ভালোবাসলো, যে তার বিরোধিতা করলো সে আমার বিরোধিতা করলো।" এ হাদিস গুলো আল-মুকাদ্দামা কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, লিখিত হচ্ছে বিখ্যাত পণ্ডিত হযরত আবু লাইস আস-সমরকন্দি এবং তাকাদ্দুমা কিতাবে বর্ণিত হচ্ছে যা পূর্ববর্তী কিতাবের ভাষ্য। মুকাদ্দিমা কিতাবের শুরুতে ইমাম আজমের প্রশংসা করে অনেক হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে। দিয়াল মানাওভী কিতাবে, এটির একটি ভাষ্য, কাজী আবু বাকা বলেন, "আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আল জাওযী বলেন, আল খতীব আল বাগদাদীর কথার উপর ভিত্তি করে এ হাদিস গুলো মউযু।" তার এমন মন্তব্য গোড়ামির পরিচয় দেয়, এ হাদিসগুলো বেশ কয়েকজন বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবেদিন, দারুল মুখতারে তার ভাষ্য প্রমান করেন যে হাদিসগুলো মউযু না এবং হাদিস গুলো আল খায়রাত আল হিসান কিতাব থেকে বর্ণনা করেন এবং ইবনে হাজার মাক্কী লিখেছেন, পৃথিবীর অলংকার কে ১৫০ হিজরিতে তুলে নেওয়া হবে। তিনি ফিকহ শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত শামস আল আইম্মা আবদুল গাফফারি আল কারদারির কাছে গিয়েছিলেন এবং শায়খ কারদারি বলেন,, এ হাদিস গুলো অবশ্যই ইমামে আজম আবু হানিফা কে ইঙ্গিত করে যেহেতু তিনি ১৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছিলেন। বুখারী এবং মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে রয়েছে, "যদি ঈমান শুক্র গ্রহে চলে যেত, ইরানের একজন লোক তা ফিরিয়ে আনত।" ইমাম সুয়ুতি, একজন শাফেয়ী পণ্ডিত, মন্তব্য করেন যে, "সর্বসম্মিতক্রমে এটি স্বীকৃত যে এ হাদিস গুলো ইমামে আজম আবু হানিফা কে বোঝানো হচ্ছে।" নু'মান আলুসী তার ঘালিইয়্যা কিতাবে লিখেছেন, "এই হাদিস গুলো আবু হানিফা (রহ.) কে ইঙ্গিত করে এবং উনার দাদাও ইরানী বংশীয় ছিলেন। আল্লামা ইউসুফ, একজন হাম্মলী পণ্ডিত, হাফিজ আল্লামা ইউসুফ ইবনে আব্দুল বারী (লিসবন, পর্তুগাল এর কাজী) হতে তাঁর তানওয়ির স্সহিফাতে বর্ণনা করেন, আবু হানিফা কে অপবাদ দিও না এবং যারা আবু হানিফা কে অপবাদ দেয় তাদেরকে বিশ্বাস করিও না। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তার চেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি আর দেখিনাই, তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনাই। আল খাতীব আল বাগদাদী যা বলেছে তা বিশ্বাস করিও না। সে একজন আলেম বিদ্বেশী লোক ছিল। সে ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ এবং তার শিষ্যদের নিন্দা করত। ইসলামের আলেমগণ তাকে ভুল প্রমান করে তাকে নিন্দিত করেছিল। ইবনে আল জাওযির নাতি, আল্লামা ইউসুফ শামসুদ্দিন বাগদাদী তার ৪০ খণ্ডের বইটিতে মিরাতুজ জামান বইটিতে লিখেছেন যে, তিনি অবাক হন যে উনার দাদা আল খাতীবকে অনুসরণ করত।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তাঁর ইয়াহিয়া কিতাবে বলেন, ইমামে আজমের প্রশংসা করে কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন আবিদ, জাহিদ এবং আল-আরিফু বিল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম এবং ইসলামের আলেমগণের যদি ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, সেটা এ কারণে না যে তারা একজন আরেকজন কে সমর্থন করতেন না বা একজন আরেকজনের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল না অথবা তারা একজন আরেকজন কে অপছন্দ করতেন; মুজতাহিদ (রহ.) আজমাইনরা ইজতিহাদের বেলায় একজন আরেকজনের সাথে একমত হতেন না আল্লাহ কে খুশি করার উদ্দেশ্যে ও ইসলাম প্রচারের জন্যে।[৪১]

---

[৪১]. এটি Endless bliss গ্রন্থের ২য় পরিচ্ছেদ, এটি যে কোনো উসূলে হাদিসের তৈরি বানোয়াট মওয়ু হাদিস নয় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

একজন আলেম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছিলেন এবং জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি আবু হানিফার জ্ঞান বুদ্ধি সম্পর্কে কি বলবেন?" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন, "প্রত্যেকেরই তাঁর (ইমামে আজমের) জ্ঞানের প্রয়োজন হবে।" আরেকজন আলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি নুমান ইবনে সাবিতের জ্ঞান সম্পর্কে কি বলবেন যা তাঁর আছে, যিনি কুফায় বসবাস করেন?" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন, "তাঁর থেকে শিক্ষা নাও এবং সে যেরকম বলে সেরকম করতে থাকো। সে একজন ভালো মানুষ।" ইমাম আলী (র.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ যার নাম আবু হানিফা হবে তার সম্পর্কে বলে যাছি, যে কুফার অধিবাসী হবে। তার বুক জ্ঞান এবং বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ থাকবে। কিয়ামতের পূর্বে অনেক মানুষ ধ্বংস হবে শুধুমাত্র ইমামে আজমকে না মানার কারণে, যেমনিভাবে ধ্বংস হবে শিয়ারা, আবু বকর এবং ওমর (র.) কে না মানার কারণে।" হযরত আব্বাস (র.) ইমামে আজমের দিকে তাকিয়ে বলেন,, "যখন আমার পূর্বপুরুষদের ধর্মকে ধ্বংস করার মানুষ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে তখন তুমি ইসলামকে পুনর্জীবিত করবে। তুমি ভীতদের জন্যে রক্ষক এবং দ্বিধাগ্রস্তদের জন্যে আশ্রয় হবে। তুমি ধর্মদ্রোহীদের সঠিক পথে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবে। যখন ইমামে আজম যুবক হলেন তিনি ইলমুল কালাম এবং ইলমুল মারিফার শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমে পরিণত হয়। এরপর তিনি ইমাম হাম্মাদের সেবায় দীর্ঘ ২৮ বছর নিযুক্ত ছিলেন এবং সেখান থেকে পরিপক্বতা অর্জন করেন। যখন ইমাম হাম্মাদ ইন্তেকাল করেন তখন ইমামে আজম আবু হানিফা মুজতাহিদ এবং মুফতি হিসেবে তাঁর জায়গা গ্রহণ করেন। ইমামে আজমের জ্ঞানের বিশালতা এবং সক্ষমতা তাকে সারাবিশ্বে পরিচিত করে তোলে। তাঁর গুণ, জ্ঞান, সদ্বিবেচনা, আল্লাহভীতি, নির্ভরযোগ্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি, ইসলামের প্রতি ভালোবাসা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মানুষ হিসেবে তিনি সর্বগুণান্বিত ছিলেন, এ কারণে তার যোগ্যতা তাঁর যুগের অন্যান্য আলেমদের চেয়ে অনেক উপরে ছিলো। সব মুজতাহিদগণ এবং যারা তাকে অনুসরণ করত এবং উচপদস্ ব্যক্তি এমনকি খ্রিষ্টানরাও তাঁর প্রশংসা করত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বললেন, আমি হযরত আবু হানিফার কাছ থেকে দোয়া প্রাপ্ত (তবারুক) হই। আমি প্রতিদিন তাঁর মাজারে যায়। যখন আমি বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তাঁর মাজারে দুরাকাত নামাজ আদায় করি। আমি আল্লাহু তা'য়ালার নাম উচারণ করি, আর আল্লাহ আমাকে যা চাই তাই দেন। ইমাম শাফেয়ী ছিলেন ইমাম মুহাম্মদের শিষ্য।[৪২]

তিনি বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা দুজন ব্যক্তির মাধ্যমে আমাকে জ্ঞান দান করেন। আমি হাদিস শরীফ শিখেছি সুফিয়ান ইবনে ওয়াহিয়া এবং ফিকহ শিখেছি মুহাম্মদ আশ-শায়াবানী হতে। তিনি আরো বলেন, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এবং বৈশ্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাকে একজন ব্যক্তি সাহায্য করেছেন এবং আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। তার নাম ইমাম মুহাম্মদ। এবং আবার ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদের কাছ থেকে যা শিখেছি, তা আমি আয়ত্ত করতে পারতাম না যদি তিনি আমার শিক্ষক না হতেন। সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ইরাকের পণ্ডিতবর্গের সন্তান, যারা কুফার পণ্ডিতবর্গেরও শিষ্য ছিলেন। আর তারা সকলেই আবু হানিফার শিষ্য ছিলেন। ইমামে আজম ৪ হাজার মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন।

প্রত্যেক শতাব্দীর পন্ডিতেরা ইমাম আজমের মহত্ত্ব নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। হানাফি মাযহাবে ১ লাখেরও বেশি ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করা হয়। আল-হাফিজ আল কবির আবু বকর আহমদ আল-হারিজমি তার বিখ্যাত গ্রন্থ মুসনাদ লিখেন। সায়েফ আল আইমমা বর্ণনা করেন, যখন ইমাম আজম আবু হানিফা যখন কুরআন ও হাদিস থেকে কোন কিছু বর্ণনা করেন, তখন ওগুলো সম্পর্কে তিনি প্রথমে আলোচনা করেন তার শিক্ষকদের সাথে। তিনি ওই বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনায় যেতেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত সকলেই একমত পোষণ করেন।

তার ১ হাজার শিষ্য উপস্থিত থাকতো কুফার মসজিদে। তাদের মধ্যে ৪০ জন ছিল মুজতাহিদ। যখন তিনি কোন বিষয়ে উত্তর পেয়ে যান, তখন তিনি তার শিক্ষার্থীদের সাথে সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। তারা যাতে একসাথে অধ্যায়ন করতে পারে এবং তারা যেন একমত হতে পারে যে এটি কুরআন-হাদিসে উল্লেখ আছে।

এ ব্যাপারে শাহাদাতুল করিম আনন্দের সাথে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার এবং যারা তার সামনে উপস্থিত ছিল তারা এ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর তিনি তাদের বলতেন এটি লিখে নিতে। [রদ্দুল ওয়াহাবি কিতাব থেকে সংকলিত][৪৩]

---

[৪২]. ইমাম আজম আবু হানিফার দুজন উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়াবানী ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.).

[৪৩]. এটি প্রথম ইন্ডিয়ায় ১২৬৪ (১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়, পুনরায় ফারসি ভাষায় ইস্তাম্বুলে ১৪০১ (১৯৮১ খিষ্টাব্দে) মুদ্রিত করা হয়।

মুজতাহিদ হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন আরবি ভাষা এবং বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞান অর্থাৎ আওদাহ, সাহিহ, মারবি, মুতাওয়াতির, রদ করার পন্থা, বানোয়াট অভিধান, ফসিহ, রাদি এবং মাজমুন এর প্রকারভেদ, মুফরাদ, শায, নাদির, মুসতামাল, মুহমাল, মুরাব, মারেফা, ইশতেকাক, হাকিকত, মাজায, মুশতারিক, ইযদাদ, মুতলাক, মুকায়্যাদ, ইবদাল, কলব এসব বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা। তারপর সরফ, নাহু, মায়ানি, বায়ান, বালাগাত, বাদি, উসুলে ফিকহ, উসুলে হাদিস, উসুলে তাফসির শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং ইমামদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার শব্দগুলো মুখস্থ থাকা। ফকিহ হওয়ার জন্য এগুলো ছাড়াও প্রয়োজন প্রত্যেক বিষয়ের মূলপাঠ জানা এবং মূলপাঠের অর্থ, মর্মার্থ, ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করা। মুহাদ্দিস তথা হাদিস শাস্ত্রে বিদ্বান হওয়ার জন্য প্রয়োজন শ্রবণমাত্র হাদিস মুখস্থ করা। হাদিসের অর্থ, মর্মার্থ, ব্যাখ্যা জানা অথবা ইসলামের বিধিবিধান অনুসারে মূলপাঠটি বোঝা আবশ্যিক নয়। যদি একজন ফকিহ এবং একজন মুহাদ্দিস কোনো একটি হাদিস শরিফ নিয়ে পরস্পর দ্বিমত পোষণ করেন, যেমন, একজন সহিহ আর অপরজন দয়িফ বলেন, তাহলে ফকিহ এর বর্ণনা প্রাধান্য পাবে। অতএব, ইমামে আজম এর যুক্তি এবং বর্ণনা অন্যাদের বর্ণনার চেয়ে প্রাধান্য পাবে। কারণ কোনোপ্রকার মধ্যস্ততা ছাড়া সরাসরি সাহাবায়ে কেরামদের নিকট হতে অসংখ্য হাদিস শরিফ শোনার কারণে তিনি ছিলেন সর্বশ্রে ফকিহ এবং প্রথম মুজতাহিদ। এ সর্বশ্রে ইমাম কর্তৃক কথিত সহিহ হাদিসকে সকল ইসলামিক বিদ্বান সহিহ বলে গণ্য করেছেন। একজন মুহাদ্দিস একজন ফকিহের সমমর্যাদাবান হতে পারেন না এবং তিনি কখনোই একজন মাযহাবের ইমাম এর পদমর্যাদায় উপনীত হতে পারেন না।

মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভি (রহ.) তাঁর সিরাতে মুস্তাকিম নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন কিছু হাদিস শরিফ রয়েছে যেগুলো ইমাম শাফেয়ি (রহ.) দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমামে আজম গ্রহণ করেন নি। লা-মাযহাবিরা এটিকে ইমামে আজমকে কলঙ্কিত করার একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে এবং তারা দাবি করে ইমামে আজম হাদিস শরিফ অনুসরণ করেন নি। যাহোক, ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) সেসকল হাদিস গ্রহণ করেছেন যেগুলো বিশুদ্ধ এবং কোনো বিষয়ে দলিল উপস্থাপনে নির্ভরযোগ্য।

একটি হাদিস শরিফে বলা হচ্ছে : "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী হচ্ছে যাঁরা আমার সময়ে বাস করেছেন, পরের সর্বাধিক উপকারী হচ্ছে যারা তাদের দেখে সফল হবে। এবং পরবর্তী সর্বাধিক উপকারীরা হলো তারা যারা তাদের পরে আসবে" এ হাদিস শরিফে দেখা যায়-তাবেঈগণ তবে-তাবেঈগণের চেয়ে বেশি উপকারী ছিলেন। ইসলামিক সকল উলামাগন' সম্মত হন যে, ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) কতিপয় সাহাবায়ে কিরামদের দেখেছেন। তাদের কাছ থেকে হাদিস শুনেছিলেন এবং এজন্য তিনি তাবেঈনদের মধ্যে একজন ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমামে আজম সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আউফ থেকে একটি হাদিস শুনেছেন যে- "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য একটি মসজিদ বানায় জান্নাতে তাকে একটি ঘর দেওয়া হবে।" শাফেয়ী মাযহাবের একজন বিশেষজ্ঞ জালালুদ্দীন সুয়ূতী তার গ্রন্থ তাবয়ীদে সাহিফা তে লিখেছেন যে, শাফেয়ী মাযহাবের একজন আলেম ইমাম আবদুল কারিম এ বিষয়ের (যেসব সাহাবাদের ইমামে আজম দেখেছিলেন) বর্ণনা দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বই লিখেছিলেন।

দারুল মুখতারে লিখা আছে যে, ইমামে আজম সাতজন সাহাবীকে দেখেছিলেন। চার মাযহাবের ইমামদের মধ্যে কেবল ইমামে আজম সম্মানিত তাবেঈয়ানদের একজন হওয়ার গৌরবার্জন করেন। ইলমে উসূলের একটি নিয়ম আছে যে, যারা কিছু স্বীকার করেন তাদের রিপোর্টের প্রতিবেদনের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যারা এটিকে অস্বীকার করে। এটা সুস্পষ্ট যে ইমামে আজম আবু হানিফা একজন তাবেঈ হচ্ছে চার মাজাহাবের ইমামদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বম। লা-মাযহাবিরা ইমাম আজমের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে অথবা তিনি হাদিসশাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন বলে তাঁর উচ মর্যাদাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। যেভাবে তারা হযরত আবু বকর ও ওমর (র.) এর ক্ষমতাকে অস্বীকার করে, তাদের এ বিকৃত অস্বীকৃতি কোনো সাধারণ রোগ নয় যে প্রচার কিংবা উপদেশ দ্বারা একে সারানো যাবে, আল্লাহ তাদের পরিশুদ্ধ করুক।

মুসলমানদের খলিফা উমর (র.) তাঁর খুতবার সময় বলেন, : "হে মুসলমানগণ! এখন যেমন আমি আপনাদেরকে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবায় আমাদেরকে এভাবে জানিয়েছিলেন যে -"সর্বাধিক কল্যাণী লোকেরা হলো আমার সাহাবারা। তারপর সর্বাধিক কল্যাণময়ী হলো তাঁদের উত্তরসূরীগণ, এবং পরের সর্বাধিক হরো যারা তাদের পরে আসবে। তাদের পরে যারা আসবে তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী থাকবে। চার মাযহাব যা আজ মুসলিমরা অনুসরণ-অনুকরণ করছে তা হলো সেই লোকদের মাযহাব যাদের কল্যাণের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা নিশ্চিত। ইসলামিক পণ্ডিতগণ ঐক্যমত্যে ঘোষণা করেন যে, এ চার মাযহাব ব্যতিত অন্য কোনো নতুন মাযহাব গ্রহণ করা বৈধ নয়।

বাহরে রাইকের লেখক ইবনে নুযাইম আল-মিসরি (রহ.) তাঁর রচনা ইসবাহ তে লিখেছেন : “হযরত ইমাম শাফেয়ী বলেন, যে, যেব্যক্তি ফিকাহ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ হতে চান তাকে আবু হানিফার বই পড়া উচিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক বলেন, : “আমি আর একজন বিশেষজ্ঞও দেখিনি যেভাবে ফিকহের বিজ্ঞানে আবু হানিফা থেকে শিখেছি। মহান পণ্ডিত মাইসার আবু হানিফার সামনে নতজানু হতেন এবং তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করে তিনি যা জানতেন না, তা শিখে নিতেন। আমি হাজার হাজার পণ্ডিতের অধীনে পড়াশোনা করেছি। তথাপি যদি আমি আবু হানিফাকে না দেখতাম তবে আমি গ্রীক দর্শনের জালিয়াতির মধ্যে পড়তাম।

আবু ইউসুফ বলেন, : “আমি আবু হানিফার মতো হাদিসের জ্ঞানে অগাধ জ্ঞানার্জন করতে কাউকে দেখিনি। তিনি যেমন দক্ষতার সাথে হাদিসগুলো ব্যাখ্যা করতে পারেন আর কোন আলেম তা পারেনা। মহান আলেম ও মুজতাহিদ সুফীয়ান ছাওরি বলেন, : “আবু হানিফার তুলনায় আমরা ছিলাম একটি চশমা বনাম চড়ুই। আবু হানিফা সকল আলেমদের নেতা। আলি ইবনে আসিম বলেন, “যদি আবু হানিফার জ্ঞানকে সমসাময়িক সকল পণ্ডিতের মোট জ্ঞানের সাথে পরিমাপ করা হতো তবে একত্রে তাদের সকলের থেকে আবু হানিফার জ্ঞান আরও বেশি প্রমাণিত হত। ইয়াজিদ ইবনে হারুন বলেন, “আমি এক হাজার আলেমের অধীনে পড়াশোনা করেছি। তাদের মধ্যে আমি আবু হানিফাকে যতটা পেয়েছি এমন আর কাউকে দেখিনি যে আবু হানিফার মতো করতে পেরেছে অথবা বেশি জ্ঞানী ছিলেন। দামেস্কের অন্যতম পণ্ডিত মুহাম্মদ ইবনে ইউসূফ আশ শাফেয়ী ইমাম আজমের অনেক প্রশংসা করেছেন, তার সক্ষমতার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি স্বীয় গ্রন্থ উকুদুল জামান ফি মানাকিবিন নুমান এ ইমাম আজমকে সকল মুজতাহিদগণের ইমাম বলেছেন।

ইমাম আজম আবু হানিফা বলেন, : “আমরা সবকিছুর উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসি। আমরা সাহাবায়ে কেরামদের প্রতিটি শব্দের সন্ধান করে চয়ন করি এবং তারপর গ্রহণ করি। হিসাবে সেগুলো শব্দহলেও আমাদের কাছে তা কথার মতোই। রদ্দে ওয়াহাবী বই থেকে অনুবাদ এখানেই শেষ। এ বইটি ভারতে এবং ইস্তাম্বুলে ছাপা হয়েছিল যথাক্রমে ১২৬৪ [১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে।] এবং ১৪০১ [১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে]।

সাইফুল মুকাল্লিদীন আলা আনাকিল-মুনকিরিন গ্রন্থে, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল ফারসি ভাষায় লিখেছেন : লা-মাযহাবিরা বলেছেন যে, হাদিসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবু হানিফা দুর্বল ছিলেন।

তাদের এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে তারা অজ্ঞ বা হিংসুক। আল ইমাম আয-আযহাবী এবং ইবনে হাজার মক্কী বলেছেন যে, ইমাম আজম হাদিসের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চার হাজার পণ্ডিত থেকে হাদিস শিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিন শতাধিক ছিলেন তাবেয়ীন এবং হাদিসের আলেম। ইমাম আশরানী আল মিজান এর প্রথম খণ্ডে বলেছেন যে : ইমামের তিনটি মাসনাদ নিয়ে পড়াশোনা করেছি তাদের সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে তাবেঈদের সুপরিচিত আলেমগণ থেকে। সলফে সালেহীনদের নিয়ে লা-মাযহাবিদের বৈরিতা, মুজতাহিদ ইমামদের প্রতি ঈর্ষা, বিশেষ করে মুসলিমদের নেতা আবু হানিফাও তাদের বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের উপলব্ধি ও সীমিত বিবেক ইসলামি আলেমদের সৌন্দর্য ও শ্রেত্বের অস্বীকার করে। তারা সত্যের প্রতি এতটাই অসহি ‟ যে, ধার্মিক লোকেরা যা জানে তারা তা ও জানেনা। আর এটা এ কারণেই যে তারা ইসলামের ইমামদের অস্বীকার করে এবং এভাবে নিজেদের হিংসার শিরকে (বহু ইশ্বরবাদ) ধাবিত করে। এটি হাদায়েক বইয়ে লেখা হচ্ছে যে, যখন ইমাম আবু হানিফা হাদিস মুখস্থ করতেন তখন তিনি সেগুলো লিখে রাখতেন, তিন তাঁর লেখা হাদিসের বইগুলো কাঠের ব্যাগে রেখেছিলেন, যার কয়েকটি তিনি যেখানেই যেতেন সর্বদা হাতে রাখতেন। তারা এ ব্যাপারে অস্যহমান যে, সৎ ব্যক্তিদের যা আছে তা তাদের কাছে নেই। আর এটি এ কারণে যে, তারা ইসলামে ইমামদের শ্রেষ্ঠত্ব কে মানতে পারেনা। হাদায়েক গ্রন্থটিতে লেখা হচ্ছে-যখন ইমাম আজম আবু হানিফা হাদিস মুখস্থ করতেন তখন তিনি সেটা লিখে রাখতেন। তিনি কিছু হাদিসের বই, যা তিনি লিখেছেন, কাঠের বক্সে রাখতেন এবং কিছু হাদিসের বই তিনি যেখানে যেতেন সাথে করে নিয়ে যেতেন। উনার উদ্বৃত করা কিছু হাদিস প্রমান করে না যে, তিনি অল্প কিছু হাদিস মুখস্থ করেছেন। এগুলো শুধু তারা বলে যারা ইসলামের গোড়া শত্রু। তাদের গোড়ামি ইমাম আজম আবু হানিফার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করে; যখন কোনো অযোগ্য লোক কোনো পণ্ডিত কে নিয়ে কথা বলে তখন পরের জনের যোগ্যতা প্রকাশ পায়।

একটি বড় মাযহাব প্রতা করা এবং শত শত, হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং সেগুলো কুরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, যার তাফসীর এবং হাদিসের বিশেষ জ্ঞান নেই। বরং কোনো প্রকার মাযহাবের আদর্শ ছাড়া আধুনিক এবং অনন্য মাযহাব প্রতিষ্ঠা করা ইমাম আজম আবু হানিফার তাফসীর এবং হাদিসের ব্যাপারে যোগ্যতা প্রমাণ করে।

কারণ তিনি অসাধারণ শক্তি দিয়ে কাজ করে এ মাযহাবটিকে বের করে এনেছেন, তিনি সব হাদিস উদ্বৃত করার এবং হাদিসগুলোর প্রত্যেক রাবীদের নাম বর্ণণা করার সময় পাননি; এটা মর্যাদাপূর্ণ ইমামকে হিংসাত্মক ভাবে কলঙ্কিত করা বা কুৎসা রটানোর মত ব্যাপার নয়, কিন্তু এরকম বলে যে তিনি হাদিসে দুর্বল ছিলেন। এটা সবার জানা বিষয় যে, যোগ্যতা বা মেধা ছাড়া হাদিস বর্ণণা করার কোনো মূল্য নেই।

যেমন আব্দুল্লাহ আল বারর বলেন, যদি যোগ্যতা বা মেধা ছাড়া হাদিস বর্ণণা করা জায়েজ হতো তাহলে একজন ঝাড়ুদারের বর্ণণাকৃত হাদিসের মূল্য লোকমানের মেধার চেয়েও বেশি দামি হতো।

ইবনে হাজার মাক্কী হলেন শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম একজন পণ্ডিত। কিন্তু তিনি তার কিতাব কালাইদে লিখেছেনঃ হাদিসের বড় একজন পণ্ডিত আমাশ ইমাম আজম আবু হানিফাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম আজম আবু হানিফা তার প্রত্যকে প্রশ্নের উত্তর হাদিসসহ দিয়েছিলেন। আমাশ ইমাম আজম আবু হানিফার হাদিসে দক্ষতা দেখতে পেয়ে বলেন,, অহ, আপনি ফিকহের পণ্ডিত! আপনি যেন বিশেষ চিকিৎসক, এবং আমরা হাদিস পন্ডিতেরা হলাম ফার্মেসিস্ট। আমরা হাদিস বর্ণণা করি এবং বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করি, আর আপনি একজন যে এ হাদিসগুলোর অর্থ বুঝেন।

উকুদাল জাওয়াহিরিল মুনিফা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে– একবার এক লোক আসলেন এবং প্রশ্ন করলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর তখন হাদিস পণ্ডিত আমাশের সাথে ছিলেন। পণ্ডিত আমার প্রশ্নের কথা চিন্তা করতে করতে ইমাম আজম এসে পরলেন। পণ্ডিত আমাশ প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন এবং ইমাম আজমকে উত্তর দিতে অনুরোধ করলেন। ইমামে আজম তাৎক্ষণিক ভাবে প্রশ্নটির উত্তর ব্যাখ্যা সহ দিলেন। প্রশংসার সাথে আমাশ জিজ্ঞেস করলেন, হে ইমাম, কোন হাদিস থেকে আপনি এ সমাধান দিলেন? ইমাম আজম আবু হানিফা ঐ হাদিসখানা ইমাম বুখারী (র.) এর ৩ লক্ষ হাদিস মুখস্ ছিল। তিনি তার মধ্যে মাত্র ১২ হাজার হাদিস তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন কারণ হাদিস শরীফে বর্ণিত আজাব কে অনেক ভয় করতেন, যদি কোনো লোক কোনো কথা কে হাদিস বলে বর্ণণা করে, যা আমি বলিনি, সে জাহান্নামে কঠিন আজাবের সম্মুখীন হবে। অত্যাধিক তাকওয়া থাকার পরে ইমাম আজম আবু হানিফা হাদিস বর্ণণার জন্যে অনেক শর্তারোপ করেছেন। এবং সে হাদিস গুলোর বর্ণণা করেছেন যেগুলো উক্ত শর্ত পূর্ণ করেছে। অনেক হাদিস বিশারদ অসংখ্য হাদিস বর্ণণা করেছেন কারণ তাদের বিভাগ ছিল বড় আর তারা কম শর্তারোপ করেছেন। ভিন্ন শর্তারোপ করার কারণে কোনো হাদিস বিশারদ কখনও একে অপরের সম্মান খর্ব করেনি।

যদি তা না হত, তাহলে ইমাম মুসলিম (র.) ইমাম বুখারি (র.) কে আপত্তি করে কিছু বলতেন। সতর্কতা ও আল্লাহ ভীরুতার দরুন অল্প কিছু হাদিস শরিফ উল্লেখই ইমাম আবু হানিফা (র.) এর প্রশংসা ও তাঁর গুণকীর্তনের অন্যতম কারণ।[৪৪]

মিরাতুল কায়েনাত নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, ইমামে আজম আবু হানিফা (র.) মসজিদেই ফজরের নামাজ আদায় করতেন এবং দুপুর পর্যন্ত তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। আছরের নামাজ আদায়ের পর এশা পর্যন্ত পুনরায় তাঁদের পাঠ দিতেন। নামাজের পর তিনি বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার মসজিদে ফিরে এসে ফজর পর্যন্ত ইবাদত করতেন। সলফে সালেহিনের অন্যতম মিসার ইবনে খাদেম আল কুফি, যিনি ১১৫ হিজরি সনে (৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন, সহ আরো অনেক মহান ব্যক্তি এটি উল্লেখ করেন।

ব্যবসার মাধ্যমে হালাল পদ্ধতিতে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। অন্যান্য জায়গায় পণ্য বিক্রির আয় দিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের অভাব পূরণ করতেন। আয়ের একটা অংশ তিনি পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন এবং সমপরিমাণ গরীবদের দান করতেন। তাছাড়া তাঁর মা-বাবার রূহের প্রশান্তির জন্য প্রতি শুক্রবার তিনি গরীবদের মাঝে বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতেন। সাত রাস্তা সমপরিমাণ দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও কখনো তিনি তাঁর শিক্ষক হাম্মাদ (রহ.) এর ঘরের দিকে তাঁর পা প্রসারিত করেন নি। একবার তিনি জানতে পারলেন, তাঁর এক সহকর্মী বেশ কিছু পণ্য ইসলাম বহির্ভূত পন্থায় বিক্রি করেন। ইমামে আজম সহকর্মীর উপার্জিত ঐ নব্বই হাজার আখছার একটিও না নিয়ে সবটুকু গরীবদের দিয়ে দেন। দস্যুদের কুফা আক্রমণ এবং মেষ চুরির পর তিনি আশংকা করেছিলেন হয়ত মেষগুলো জবাই করে বাজারে বিক্রি করা হবে। তাই তিনি সাত বছর পর্যন্ত মেষ খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। কারণ, তিনি জানতেন একটি মেষ সর্বোচ সাত বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। তিনি ন্যুনতম হারাম থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে চলতেন। তিনি প্রতি পদক্ষেপে ইসলামকে অনুধাবন করতেন।

---

[৪৪]. সাইফুল মুকাল্লেদীন আলান্নাকাইল মুনকিরীন।

ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) চল্লিশ বছর যাবৎ এশার নামাজের অযু দ্বারা ফজরের নামাজ আদায় করতেন (অর্থাৎ, এশার নামাযের পর ঘুমাতেন না।) তিনি পঞ্চান্ন বার পবিত্র হজ্জ আদায় করেছেন। শেষ হজ্জের সময় তিনি পবিত্র কাবা শরিফে দুরাকাত নামাজ আদায় করেন এবং ঐ নামাজে সম্পুর্ণ কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করেন। তারপর, ক্রন্দনরতসুরে প্রার্থনা করেন, হে আমার আল্লাহ তা'য়ালা! আপনার যোগ্য পন্থায় আপনার এবাদত করতে আমি সক্ষম নয়। কিন্, আমি খুব ভালো ভাবে উপলব্ধি করেছি যে আপনাকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমার এ উপলব্ধির কারণে আমার এবাদতের ত্রুটিসমুহ ক্ষমা করে দিন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়, হে আবু হানিফা! আপনি আমাকে খুব ভালো ভাবেই স্বীকার করেছেন এবং চমৎকারভাবে আমার এবাদত করেছেন। আমি আপনাকে এবং সে সকল মুসলিমদের ক্ষমা করে দিয়েছি যারা পৃথিবীর সমাপ্তি পর্যন্ত আপনার এবং আপনার মাযহাবের অনুসরণ করবে। তিনি প্রতি দিন এবং প্রতি রাতে পবিত্র কুরআনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন।
ইমামে আজম এতই মুত্তাকি ছিলেন যে, তিনি ত্রিশ বছর যাবৎ প্রতিদিন রোজা রাখতেন (নিষিদ্ধ পাঁচদিন ব্যতীত)। তিনি প্রায় সময় এক অথবা দুই রাকাতে পুরো পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এবং মাঝে মধ্যে নামাজের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে জান্নাত এবং জাহান্নামের বর্ণনাসূচক একটি আয়াত কান্না করতে করতে তেলাওয়াত করতেন।[৪৫]
যে সকল মানুষ শুনতেন তাঁরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর উম্মতদের মধ্যে যারা নামাজের একটি রাকাতে সম্পুর্ন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তাঁরা হলেন, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.), তামিম আদ্দারি (রা.), সাদ বিন যুবায়ের (রা.) এবং ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.)। তিনি কারো কোনো ধরনের উপহার গ্রহণ করতেন না। গরীবের মতো পোশাক পরিধান করতেন। কিন্তু আল্লাহর দয়া প্রদর্শনে খুবই মুল্যবান পোশাক মাঝেমধ্যে পরিধান করতেন। তিনি পঞ্চান্ন বার হজ্জ আদায় করেছেন এবং কয়েক বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন। শুধুমাত্র তাঁর ওফাত স্থানেই তিনি সাত হাজার বার পুরো পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। তিনি বলেন, সারা জীবনে আমি একবার হেসেছি এবং এর জন্য অনুতপ্ত হয়েছি। তিনি অল্প কথা বলতেন এবং গভীর চিন্তা করতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতেন। এক রাতে এশার নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করার সাথে সাথে বের হওয়ার সময় তিনি তাঁর শিষ্য ইমাম জুফার (রহ.) এর সাথে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তখন তাঁর এক পা মসজিদের ভেতরে এবং অন্য পা মসজিদের বাহিরে ছিল। আলোচনাটি ফজরের নামাজের আজান পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারপর, অন্য কোন কাজ না করে তিনি ফজরের নামাজ আদায় করতে গেলেন। তিনি তাঁর উপার্জনের চার হাজার দিরহামের অতিরিক্ত সবকিছু দান করে দিতেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, ব্যক্তিগত ভাতা চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত রাখা জায়েয।
খলিফা মনসুর ইমামকে খুব সম্মান করতেন। তিনি ইমামকে দশ হাজার আখছা এবং একটি জারিয়া উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম সেগুলো গ্রহণে অসম্মতি জানান। সে সময় একটি আকছা একটি রৌপ্যের দিরহামের সমমূল্যের ছিল। ১৪৫ হিজরি সনে, ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে আলী (রা.) তাঁর ভাই মুহাম্মদ (রা.), যিনি নিজেকে মদিনা মুনাওয়ারার খলিফা দাবি করেছিলেন, এর সাহায্যের জন্য লোক নিয়োগ দিছিলেন। তিনি যখন কুফায় আগমন করেন, গুজব রটে ইমাম তাঁকে সাহায্য করছিলেন। মনসুর এটি শুনতে পায় এবং ইমামকে কুফা হতে বাগদাদ নিয়ে যায়। তিনি ইমামকে বলেন, ইমাম যেন সবাইকে বলেন, আইনসঙ্গতভাবে মনসুরই খলিফা।
পরিবর্তে তিনি ইমামকে বিচার বিভাগের সভাপতিত্বের পদ প্রস্তাব করে। তিনি ইমামকে খুব নিপীড়ন করে। তথাপি, ইমাম সেটি গ্রহণ করেন নি। মনসুর ইমামকে কারারুদ্ধ করে এবং চাবুক দিয়ে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করে। তাঁরা পবিত্র পা রক্তাক্ত হচ্ছে যায়। মনসুর অনুশোচিত হয় এবং ইমামকে আরও ত্রিশ হাজার আখছা প্রদান করে। কিন্তু তা আবার প্রত্যাখাত হয়। তিনি আবার ইমামকে কারারুদ্ধ করে এবং প্রতিদিন আরও দশটি করে বেত্রাঘাত বৃদ্ধি করতে থাকে।
(বিভিন্ন মত অনুসারে) একাদশতম দিনে জনগণ বিদ্রোহী হওয়ার ভয়ে ইমামকে জোরপূর্বক শায়িত করা হয় এবং বিষাক্ত পানীয় তাকে পান করানো হয়। মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি সেজদারত হন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ তাঁর জানাযার নামাযে শরীক হন। জনসাধারণের প্রচুর ভিড়ের কারণে অনেক প্রতিবন্ধকতার তাঁর নামাজে জানাযা আদায় করা হয় এবং মাগরিবের নামাজের আগে তা সম্পাদন সম্ভব হয় নি। প্রায় বিশ দিন পর্যন্ত তাঁর কবরে অনেক লোকজন যিয়ারত করতে আসেন এবং তাঁর কবরের পাশেই তাঁর নামাজে জানাযা আদায় করা হয়।

---

[৪৫]. আল্লাহর প্রেমে নামাজের ভিতরে কান্না করলে হানাফি মাজহাব অনুসারে নামাজ বিনষ্ট হয় না।

তাঁর শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন সাত হাজার তিনশত জন যাদের প্রত্যেকেই নিজ গুনাবলি ও কর্মের মাধ্যমে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদের অনকেই মুহাদ্দিস, মুফতি ছিলেন। তাঁর নিজ পুত্র হযরত হাম্মাদ (রহ.) ছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের অন্যতম। মিরাতুল কায়েনাত বইয়ের অনুছেদের এখানেই ইতি ঘটেছে।

তারা নেতৃবৃন্দ (রহ.) ছিলেন আহলে-দ্বীনের পথনির্দেশক। ইমামে আজম এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিল, যা তাদের ইজতিহাদ উপলব্ধির মাধ্যমে বুঝা যায়। এ হাদিসটি উক্ত মতপার্থক্যকে উপকারী সাব্যস্ত করে, আমার উম্মতের মতপার্থক্য আল্লাহর রহমত। তিনি আল্লাহকে বেশি ভয় করতেন এবং কুরআন কে নিজের মধ্যে ধারণ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তিনি তার শিষ্যদের বলেন,, যদি তোমরা কোনো বিষয়ে এমন দলিল পাও যা আমার কথার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে আমার কথাকে অস্বীকার করে দলিল কে গ্রহণ কর। তার শিষ্যরা কসম করে বলেন,, তারা ইমামে আজম থেকে শুনেছিলো, এমন কি যদি তাদের কথাও ইমামে আজমের কথার বিরুদ্ধে কোনো দলিলের ভিত্তিতে যায় (তারা যেন ইমামের আজমের কথা কে অস্বীকার করে তাদের টা গ্রহণ করে)।

হানাফি মাযহাবের মুফতিদের ফতোয়া দিতে হয় ইমামে আজমের কথার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। যদি তারা ইমামে আজমের কথা খুজে না পায় উক্তি বিষয়ে, তখন তারা ইমামে আবু ইউসুফ কে অনুসরণ করবে। তার (ইমাম আবু ইউসুফ) পরে ইমাম মুহাম্মদ কে অনুসরণ করবে। যদি কোনো বিষয়ে ইমামে আজমের কথার সাথে ইমাম ইউসুফ ও ইমামে মুহাম্মদের কথা না মিলে, তখন মুফতিরা যেকোনো একজনের কথার উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিতে পারবে। যখন কোনো মুফতি জরুরী (এমন এক অবস্থা যে কারো কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া সম্ভব না) ফতোয়া প্রদান করবে, তখন যেই মুজতাহিদ সহজ উপায় দেখিয়েছিলো তার কথার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফতোয়া দিতে পারবে। তিনি এমন কোনো ফতোয়া দিতে পারবেন না যার সাথে কোনো মুজতাহিদের কথার কোনো সামঞ্জস্য নেই। তার দেওয়া সমাধান ফতোয়া হিসাবে পরিগণিত হবে না।[৪৬]

---

[৪৬]. ফতোয়া ' অর্থ একটি চূড়ান্ত রায় যা একজন অনুমোদিত ইসলামের আলেম মুসলমানদের প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ধর্মীয়ভাবে সরবরাহ করে থাকেন যাতে মানুষ কীভাবে তারা আমল করতে পারে এবং তা নিয়ে তারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। ফতোয়ার উৎসাবলি রায়ের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

ওয়াহাবিবাদ এবং আহলুস সুন্নাহ দ্বারা এর খণ্ডন

নজদি নামে খ্যাত ওহাবিরা যদিওবা নিজেদের মুসলিম হিসেবে দাবী করে বরং তারা আহলুস সুন্নাহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটি দল। আহমেদ শেভদেট পাশা, একজন রাজনীতিবিদ এবং আইয়ুব সাবেরি পাশা [মৃত্যু-১৩০৮ (১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ।)], চৌত্রিশতম উসমানীয় সুলতান আবদুল হামিদ খান দ্বিতীয় [১৯১৮-১৮৪২] ১৩৩৬-১২৫৮)এর আমলের রিয়্যার এডমিরাল, ইস্তাম্বুলের সুলতান মাহমুদের মাজারে সমাধিস্থ হওয়া) (রহ.) প্রত্যেকে একটি ইতিহাসের বই লিখেছিল, তাতে তারা সম্পূর্ণরূপে ওহাবিবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন।[৪৭]

নিম্নলিখিত অনুবাদটি করেছেন পরবর্তীকালের বই থেকে, বেশিরভাগ অংশেই প্রাপ্ত আহমদ জয়নাল দাহলন[৪৮] অনূদিত ফিতনাতুল ওয়াহিবিবিয়া গ্রন্থ হতে। তিনি (আহমদ জয়নাল) ১৩০৮ হিজরি, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদি কর্তৃক ওয়াহাবি মতবাদটি প্রতিতি হয়েছিল। তিনি ১১১১ হিজরিতে নজদের হুরাইমিলাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১২০৬ হিজরি (১৭৯১খ্রি.) তে মৃত্যুবরণ করেন। ইতঃপূর্বে তিনি ব্যবসা এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বসরা, বাগদাদ, ইরান, ভারত এবং দামেস্কে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ১১২৫ হিজরি (১৭১৩খ্রি.) এ বসরায় অবস্থান করছিলেন তখন বৃটিশ গোয়েন্দা হেমপারের প্রলোভনে প্রলোভিত হচ্ছে ছিলেন। হেমপার ছিল সেসব বৃটিশ গোয়েন্দাদের দলভুক্ত যারা বৃটিশ পরিকল্পনা মোতাবেক ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করতো।

তিনি গুপ্তচর কর্তৃক প্রস্তুত অযৌক্তিকতাকে ওয়াহাবিজম নামে প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের Confessions of British SPY বইটিতে ওহাবিবাদ প্রতির বিস্তারিত তথ্য দেয়া আছে। সেখানে তিনি পেয়েছেন এবং হররানের আহমদ ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮), [১২৬৩-১৩২৮, মৃত্যু দামেস্কে] এর লিখিত বইসমূহ যেসব ছিল আহলে সুন্নাহর আক্বিদার সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি অতীব ধূর্ত ব্যক্তি হওয়ায় তিনি আশ শায়খ নজদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বৃটিশ গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় তিনি Kitab at-tawhid[৪৯] রচনা করে ছিলেন। বইটির টীকাকার ছিলেন তার নাতি আব্দুর রহমান এবং বইটি মিশরে Fat-h al-majid নামে প্রবেশ ও পাবলিশ করেন মুহাম্মদ হামিদ নামক এক ওয়াহাবি।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের চিন্তা দ্বারা গ্রামবাসী এবং দারিয়ার বাসীন্দারা ও তাদের প্রধান মুহাম্মদ ইবনে সওদকে প্রভাবিত করেছিল। লোকজন যারা তার মতাদর্শ ওয়াহাবীয়া (ওহাবীজম) গ্রহন করেছিল তাদেরকে ওয়াহাবী বা নজদি বলা হত। তাদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি হতে লাগলো এবং সে নিজেকে কাজী পদে এবং মুহাম্মদ ইবনে সওদকে আমীর (Ruler) পদে উন্নিত করলো! তিনি এটি আইন অনুযায়ী ঘোষণা দিল যে শুধু মাত্র তাদের উত্তর পুরুষরাই তাদেরকে সফল করেছিল।

মুহাম্মদ পিতা আবদুল ওহাব যে ছিল একজন ধর্মিক এবং মদিনার স্কলার। তিনি ইবনে আবদুল ওহাব এ নাম ধারণ করে একটি ভিন্ন কেন্দ্রিক অদ্ভূত আন্দোলন শুরু করে ছিল এবং সবাইকে নিদের্শ দিয়েছিল তার সাথে কথা না বলতে। কিন্তু তিনি ওয়াহাবিজম প্রকাশ করেছিলেন ১১৫০ হিজরি, ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইসলামি আলেমদের ইজতিহাদকে মন্দ (ক্ষতিকর) বলতেন। আহলে সুন্নাহ অনুসারীদের তিনি কাফের পর্যন্ত বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজায় এবং অলী (র.)'র মাজারে গিয়ে ইয়া নবী আল্লাহ অথবা ইয়া আব্দুল কাদের বলে সম্মোধন করতো তিনি তাদেরকে মুশরিক হিসেবে গন্য করতেন। ওহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যারা বলবে আল্লাহর পাশে কিছু আছে তারা অবশ্যই মুশরিক হচ্ছে যাবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি বলে এ এই ওষূধ গুলো ব্যথা উপশম করেছে অথবা আল্লাহ তা'য়ালা আমার দোয়া নবী কিংবা অলীর ওসীলায় কবুল করেছেন তবে সেও মুশরিক

---

[৪৭]. Târîkh-i Othmânî ১২ খণ্ড বইয়ের ৭ম খণ্ড এবং গরৎ'জঃ ধষ-ঐধৎধসধরহ বইয়ের শেষ ৫ খণ্ডের ৩য় খণ্ড (পৃ. ৯৯.Turkish, the Library of Süleymâniyye).

[৪৮]. আহমদ দাহলান (রহ.), (১২৩১[১৮১৬], মক্কা-১৩০৪ [১৮৮৬], মদিনা), মক্কার মুফতি।

[৪৯]. মক্কার পণ্ডিতেরা 'Kitab at-tawhid' এ খুব সুন্দর উত্তর লিখেছিলেন এটি ১২২১ সালে পরিশুদ্ধ কুমেন্টগুলির সাথে খণ্ডন করে তাদের সাইফ আল-জব্বার শিরোনামে খণ্ডন, যা পরে পাকিস্তানে ছাপা হয়েছিল ১৩৯৫ [১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে।] ইস্তাম্ঘুলে পুনরায় ছাপানো হয়েছিল।

হিসেবে গন্য হবে। তাদের এ মতকে প্রমাণিত করার জন্য তারা একটি আয়াত কারীমা দলীল হিসেবে পেশ করে-ইয়্যাকা নাস্তায়িন (আমরা শুধু আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) সুরা ফাতিহার আয়াত যা তাওয়াককুল অর্থে অবতীর্ণ।[৫০]
পারসিয়ানে রচিত আল উসুলুল আরবা ফি তারদিদিল উয়াহাবিয়াহ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের শেষের দিকে বলা হচ্ছে-ওয়াহাবি এবং অন্যান্য লা-মাযহাবি লোকজন গধলধল মাজায[৫১] এবং Ishtiara ইশতিয়ারা (রূপক) অর্থকে গ্রহণ করে না। যখনই কেউ বলে যে সে কিছু করেছে, তখন তারা তাকে কাফের মুশরিক বলে অভিহিত করে যদিও তার অভিব্যক্তিটি রূপক (মাজায) হয়। যাহোক, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রতিটি কাজেরই সত্যিকারের নির্মাতা এবং মানুষ রুপক নির্মাতা। সূরা ইউসুফ এবং সূরা আল আনামের ৫৭ নং আয়াতে তিনি বলেন-সিদ্ধান্ত (হুকুম) একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই।
এজন্য আল্লাহ পাক-ই একমাত্র ফয়সালাকারী (হাকিম)। সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতে তিনি আরও বলেন-তারা কখনও ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে (রসুল দ.) ন্যায়বিচারক (ইয়ুহাক্বিমুনাকা) বলে মনে করবে।
উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক-ই একমাত্র প্রকৃত বিচারক। আর পরবর্তী আয়াতে, মানুষকে রুপকার্থে বিচারক হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রত্যেক মুসলিমই জানেন যে, আল্লাহ তা'য়ালাই একমাত্র জীবনদানকারী এবং জীবন কেড়ে নিতে পারেন। এজন্য তিনি ঘোষণা দিয়ে বলেন-একমাত্র তিনিই জীবনদানকারী ও মৃত্যুদানকারী। সূরা ইউনুসের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-একমাত্র তিনিই (আল্লাহ) মানুষের মৃত্যুর সময় হলে মৃত্যু দিয়ে থাকেন।
সূরা যুমারের ৪২ এবং সূরা সাজদার ১১ নং আয়াতে তিনি বলেন-তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। একমাত্র তিনিই (আল্লাহ তা'য়ালা) অসুস্থতা থেকে সুস্তা দান করেন। সুরা শুয়ারার ৮০ নং আয়াতে তিনি বলেন-যখন আমি অসুস্থ হই, তখন একমাত্র তিনিই (আল্লাহ পাক) আমাকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন। সুরা আলে ইমরানের ৪৯ নং আয়াতে ঈসা (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন-আমি অন্ধ এবং কুরোগী কে নিরাময় দিয়ে থাকি এবং আল্লাহ পাকের আদেশে মৃতকে জীবিত করে তুলি। যিনি মানুষকে সন্তান দান করে থাকেন তিনি একমাত্র আল্লাহ। সূরা মারইয়ামের ১৮ নং আয়াতে দেখা যায়, জিবরাইল (আ.) রুপকার্থে মারইয়াম (আ.) কে বলেন-আমি আপনাকে একটি নেককার সন্তান দান করব।
মানুষের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। সূরা বাক্বারার ২৫৭ নং আয়াতে সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-বিশ্বাসীদের ওলি (রক্ষাকারী, অভিভাবক) আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি আরো বলেন-তোমাদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ পাক ও তাঁর রসুল (দ.)। আর নবি (দ.) বিশ্বাসীদেরকে বেশি রক্ষা করেন, যতটা তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। (সূরা মায়েদার ৫৬ নং এবং আহযাবের ৬ নং আয়াত।) মূলত তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, রূপকার্থে মানুষও অভিভাবক হতে পারে। পাশাপাশি আল্লাহ পাক-ই প্রকৃত অভিভাবক। তিনি আরো বলেছেন রুপকার্থে মানুষ হলেন সাহায্যকারী (মুঈন)। সূরা মায়েদার ২ নং আয়াতে তিনি আরো বলেছেন-সৎকর্ম এবং খোদাভীতিতে তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করো। ওয়াহাবিরা এ শব্দটাকে মুশরিক হিসেবে ব্যবহার করে।
১। একজন চর্ম রোগী, যার শরীরের চামড়ার প্রায় সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ শ্বেতকায়।
ওয়াহাবিরা এমন মুসলমানদের জন্য মুশরিক শব্দটি ব্যবহার করে, যারা আল্লাহ তায়া'লা ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে আবদ' (চাকর, গোলাম) বলে সম্বোধন করে। যেমন, 'আবদুন্নবি' বা 'আবদে রসুল' তবে সুরা নূরের ৩২ তম আয়াতে একটি ঘোষণা করা হচ্ছে : "বিবাহ করুন আপনার অবিবাহিত মহিলাদের এবং তোমার ঈমানদার পুরুষ গোলাম (বান্দা বা দাস) ও মহিলা দাসদের মধ্যে থেকে। মানুষের আসল খোদা (পরিচালক) হলো আল্লাহু তায়া'লা, তবে অন্য কাউকে রূপকভাবে

---

[৫০]. অত্র আয়াতের প্রকৃত ও সঠিক অর্থ যা আহলে সুন্নাতের উলামারা ব্যাখ্যা করেছেন তা Endless Bliss বইয়ের ৩য় খণ্ডের ৩৫ নং চ্যাপ্টারে উল্লেখ আছে। সেসব মানুষ যারা তাওহিদের প্রকৃত অর্থ জানেন তারা সহজেই ওয়াহাবিদের বুঝতে সক্ষম হবেন। যদিওবা ওহাবিরা নিজেদের মুওয়াহহিদ বলে দাবি করে আদপে তারা মুওয়াহহিদ (তাওহিদে বিশ্বাসী) নয়।

[৫১]. মাজায : মাজায হলো শব্দের ব্যবহার যা তার স্বাভাবিক বা স্পষ্ট আক্ষরিক অর্থ নয় তবে এর অর্থের সাথে সামঞ্জস্যতা বুঝাতে ব্যবহার হয় । যখন আল্লাহর সাথে বিশেষিত কোন একটি শব্দকে সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এটি মাজাযি (রূপক, প্রতীকী) অর্থে ব্যবহৃত হয। ওয়াহাবীগণ এটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন এবং যারাই এটিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করে তাদেরকে মুশরিক ও কাফের হিসেবে অভিহিত করে। তারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ যে এই শব্দগুলোই সাধারণ মানুষদের জন্য কুরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

রব' বলা যেতে পারে; সুরা ইউসুফের ৪২ তম আয়াতে বলা হচ্ছে, আপনার রবের নিকট আমার ব্যাপারে আলোচনা করবেন।

ইস্তিগাছা' (সাহায্য) যা ওয়াহাবিরা সর্বাধিক বিরোধিতা করে : আল্লাহু তায়া'লা ছাড়া অন্য কারও নিকট সুরক্ষা বা সাহায্য চাওয়াকে তারা শিরক বলে। প্রকৃতপক্ষে, সকল মুসলমান-ই জানেন যে, সত্যিকার ইস্তিগাছা কেবলমাত্র আল্লাহু তায়া'লার পক্ষ থেকেই হয়। তবে একথাও বলা বৈধ যে, কেউ কারও কাছ থেকে রূপকভাবে ইস্তিগাছা করতে পারে, কারণ এটি ঘোষণা করা হচ্ছে সুরা আল-কাসাসের ১৫ তম আয়াতে ঘোষণা এসেছে : "তাঁর গোত্রের লোকেরা শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর কাছ থেকে ইস্তিগাছা করেছিল। একটি হাদিস শরিফে বলা হচ্ছে : "তারা ময়দানে মাহশারের জায়গায় আদম (আ.) থেকে ইস্তিগাছা বা সাহায্য চাইবে। আল-হাসান এর একটি হাদিস শরিফে আল-হাসিন বলেন, "সাহায্য প্রত্যাশীর বলা উচিত, হে আল্লাহ তা'য়ালার বান্দা! আমাকে সাহায্য করুন! '"এই হাদিস শরিফ আমাদের নির্দেশনা দেয় যে, নিকটবর্তী নয় এমন কারও কাছ থেকে সাহায্যের জন্য ডাকা।[৫২]

আল-উসুলে আরবার বইটি থেকে অনুবাদ এখানেই শেষ।

[প্রতিটি শব্দের একটি পৃথক অর্থ রয়েছে, যাকে বলা হয় ঐ শব্দটির আসল অর্থ, যখন শব্দটি এর আসল অর্থে ব্যবহার করা হয় না তবে তার সাথে সম্পৃক্ত অন্য যেকোনও অর্থ হতে পারে তখন তাকে মাজায বলা হবে। যখন আল্লাহ তায়া'লা মানুষের জন্য বিশেষ শব্দ রুপকার্থে ব্যবহার করেন, ওয়াহাবিরা তখন মনে করে যে, এটিকে আসল অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং, তারা তখন কোনও ব্যক্তিকে মুশরিক বা কাফির ডাকবে, যারা ঐ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে। তবে তাদের মনে রাখা উচিত যে, এ শব্দগুলো আয়াত এবং হাদিস শরিফে মানুষের জন্য মাজায হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।] রাসুলুল্লাহ (দ.) এবং আউলিয়া কিরামদের কাছ থেকে সহায়তা (শাফায়াত) চাওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা তিনি যে সৃষ্টিকর্তা সে কথা ভুলে যাওয়া। এটা হলো তাঁর কাছ থেকে মেঘের মাধ্যমে বৃষ্টির প্রত্যাশা কারণ বা উপায়ের (ওয়াসিলা) মতো।

ওষুধ সেবন করে তাঁর কাছ থেকে নিরাময়ের আশা; কামান, বোমা, রকেট এবং বিমান ব্যবহার করে তাঁর কাছ থেকে বিজয় আশা করা, এসবই কারণ। আল্লাহ পাক সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন কোনো না কোনো কারণের মধ্য দিয়ে। এগুলোকে ধরে রাখা মুশরিকতা (শিরক) নয়। নবি (আ.) গণ সর্বদা কারণ বা মাধ্যমগুলোর জন্য অনড় থাকতেন। যেমন–আমরা জল পান করতে একটি ঝর্ণায় যাই, যা আল্লাহ তা'য়ালা তৈরি করেছেন, এবং বেকারিতে রুটির জন্য; যা তিনি আবার তৈরি করেছিলেন এবং আমরাও অস্ত্র তৈরি করি, ঘাম ঝরাই এবং আমাদের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি যাতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের বিজয় নে, ঠিক তেমনি আমরা আমাদের প্রাণকে একজন নবী বা ওলি আল্লাহর অন্তরের সাথে স্থাপন করার চেষ্টা করি যেন আল্লাহ তায়া'লা আমাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করেন (তাঁদের উসিলায়)। রেডিও ব্যবহার করে একটি শব্দ শোনার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে তা তৈরি করে দেন, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তাঁর সম্পর্কে ভুলে যাওয়া এবং একটি বাক্সে পক্ষে আশ্রয় নেওয়া তাঁর পক্ষে না নিয়ে, বরং যিনি এ বিশেষত্ব, এ শক্তিকে দিয়েছেন যান্ত্রিক রেডিও বাক্সে তাঁর পক্ষে থাকা দরকার। এভাবেই আল্লাহু তায়া'লা তাঁর শক্তিকে লুকিয়ে রেখেছেন প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই। একজন মুশরিক মূর্তি পূজা করে কিন্তু সে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ভাবে না, কিন্তু একজন মুসলিম যখন বিভিন্ন কারণ ও উপায় উপকরণ ব্যবহার করে, তখন সে আল্লাহ তায়া'কে নিয়ে চিন্তা করে; যিনি এ বস্তু এবং সৃষ্টিসমূহে কার্যকারিতা ও বিশেষত্ব সরবরাহ করেছেন। কারণ, সে চায় এবং আল্লাহ তা'য়ালার থেকে তা প্রত্যাশা করে। সে জানে যে, সে যা পায় তা আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকেই আসে। উপরোক্ত বর্ণিত আয়াতের অর্থ নির্দেশ করে যে, এটিই সত্য। এজন্য প্রতিটি নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠের সময় বিশ্বাসীরা বলে, হে আমার রব! আমার পার্থিব ইছা এবং চাহিদা পেতে আমি বৈষয়িক এবং বৈজ্ঞানিক কারণগুলোকে ধরে রেখেছি, আপনার প্রিয় বান্দাদের আমাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করুন। যেমনটি আমি সর্বদা করি এবং সর্বদা বিশ্বাস করি তুমিই একমাত্র দাতা, আমাদের ইছারাজির স্রষ্টা। আমি শুধু তোমারি কাছ থেকে প্রত্যাশা করি! যে বিশ্বাসীরা প্রতিদিন এ কথাগুলো বলে তারা অন্যজনকে মুশরিক বলতে পারেনা। নবী-রসুল এবং আউলিয়া কিরামদের আত্মা থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা মানে এ কারণগুলোকে (ওয়াসিলা) ধারণ

---

[৫২]. আল-উসুল আল-আরবা' ফি তারদীদ আল-ওয়াহাবিয়্যা (ফারসি ভাষায়(, এর শেষের দ্বিতীয়াংশ, ভারত, ১৩৪৬ [১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ]; ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি ইস্তাম্বুল, ১৩৯৫ (১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)। এই বইটি লিখেছিলেন মুহাম্মদ হাসান জান সাহেব, যিনি হযরত ইমাম রাব্বানী (রহ.) এর অন্যতম নাতি। লেখক জান সাহেব, তাঁর আরবি রচনা তারিক আন-নাজাত, ভারত, ১৩৫০ (উর্দু অনুবাদ সহ); এর মধ্যে ওয়াহাবি ও অন্যান্য লা-মাযহাবী লোকদের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি, ইস্তাম্বুল, ১৩৯৬[১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ]।

করা, যা আল্লাহ পাকের দ্বারাই সৃ।" সুরা ফাতিহার এ আয়াতটি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে য়ে যে, তারা মুশরিক নয় বরং সত্য বিশ্বাসী। ওহাবীরাও বৈষয়িক উপাদান ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এর পেছনে লেগে থাকে। তারা তাদের কামুক বাসনাগুলোকে যেকোনো উপায়ে পূরণ করে। যদিও তারা এটাকে শিরক বলে নবী এবং আউলিয়াদেরকে মধ্যস্তাকারী হিসাবে ডেকে আনে প্রমাণও করতে চায়।

যেহেতু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের কথা ছিল সবই নিজের কাঙ্ক্ষিত ইছা অনুযায়ী, যেসব মানুষের ধর্মীয় জ্ঞান ছিলনা তারা তা সহজে বিশ্বাস করত। তারা জোর দিয়েছিল যে, আহলে সুন্নাহর পণ্ডিতগণ এবং সত্য পথের মুসলমানগণ হলেন অবিশ্বাসী। আমিরগণ (নেতার.) ওয়াহাবীতত্ত্বকে তাদের (ওহাবিদের) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের জমিজমা, অঞ্চলকে আরও বাড়ানোর সাথে সংগত কারণ বলে পেয়েছেন। তারা আরব উপজাতিদের ওহাবী হতে বাধ্য করেছিল। তারা এমন লোকদের হত্যা করেছিল যারা তাদেরকে বিশ্বাস করতো না। গ্রামবাসীরা মৃত্যুর ভয়ে দারিয়ার আমির মুহাম্মদ ইবনে সাদের কথা মেনে চলতেন। আমিরের সৈনিক হচ্ছে উঠে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে উপযুক্ত করে তুলতে সম্পত্তি, জীবন ও অ-ওয়াহাবীদের পবিত্রতায় আঘাত হানত।।

শায়খ সুলায়মান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব এর ভাই, একজন সুন্নী আলিম ছিলেন। এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তা রচিত সাওয়ায়িখ আল ইলাহিয়্যা ফি রদ্দে আল ওয়াহাবিয়্যা গ্রন্থে ওয়াহাবিজমের খণ্ডন করেন, এবং প্রচলিত মতবিরোধী মতবাদ ওয়াহাবিজম এর ভ্রান্তি প্রতিরোধ করেন। এ মূল্যবান গ্রন্থটি ১৩০৬ সালে ছাপানো হয়েছিল। এটির অফসেট ইস্তানবুল থেকেও ছাপানো হয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব এর শিক্ষকেরা উপলব্ধি করেন যে আবদুল ওয়াহাব এমন একটা মতবাদ এর দ্বার উম্মোচন করে যেটা ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে। আব্দুল ওয়াহাব এর শিক্ষক এ ভুল মতবাদের বিরোধিতা করেন। তারা ঘোষণা দেন যে আবদুল ওয়াহাব সঠিক পথ থেকে পথচ্যুত। তারা প্রমাণ করেন যে ওয়াহাবিরা কুরআনুল কারীমের এবং হাদিস শরীফের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারপরও এসব, কর্মকাণ্ড ঈমানদারদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ মানুষের অসন্তোষ ও শত্রুতা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ওয়াহাবিবাদ জ্ঞানের মাধ্যমে নয় বরং প্রচারিত হয়েছিল কিছু অজ্ঞ মানুষের নিুরতা এবং রক্তপাতের দ্বারা। এইসব নিুর লোকদের মধ্যে যারা নিজেদের হাতকে রক্তে রঞ্জিত করেছে। দারিয়া এর আমির মুহাম্মদ ইবনে সাদ ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিুর। এ ব্যক্তি বনু হানিফা উপজাতির ছিল এবং বংশধরদের মধ্যে অন্যতম ছিল, যারা মুসাইলামাতুল কাযযাবকে একজন নবী হিসেবে বিশ্বাস করেছিল। তিনি ১১৭৮ হিজরিতে (১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) মারা যান এবং এর পরে তাঁর স্লাভিষিক্ত হন তার পুত্র আবদুল আজিজ যিনি তার সময়ে ১২১৭ হিজরিতে একজন শিয়ার হাতে নিহত হয়েছিলেন। তারপর তাঁর স্লাভিষিক্ত হন তার পুত্র সাদ যিনি ১২৩১ হিজরিতে মারা যান। সৌদ এর পুত্র আবদুল্লাহ, তার জায়গায় এসেছিলেন, কেবলমাত্র তাকেই ইস্তাম্বুলে ১২৪০ হিজরিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

তাঁর স্থানটিতে তারেক ইবনে আবদুল্লাহ স্লাভিষিক্ত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন আবদুল আজিজ এর পৌত্র। ১২৫৪ হিজরিতে তারেকের স্লাভিষিক্ত হয়েছিলেন ফয়সাল, তাঁর পরে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ১২৮২ সালে ফয়সাল এর স্লে এসেছিলেন। তাঁর ভাই আবদুর রহমান এবং তার পুত্র আবদুল আজিজ কুয়েতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। ১৩১৯ হিজরিতে [১৯০১ সালে] আবদুল আজিজ রিয়াদ চলে যান এবং সেখানের আমির হন। ১৯১৮ সালে বৃটিশদের সাহায্যে তিনি মক্কা আক্রমণ করেছিলেন। ১৩৫১ হিজরিতে, ১৯৩২ সালে সৌদি আরব রাষ্ট্র প্রতি করেন। আমরা ১৯৯১ সালে সংগ্রহ করা সংবাদপত্রগুলোতে জানতে পারি যে, সৌদি আরবের আমির ফাহাদ রাশিয়ান কাফেরদের চার বিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন আফগানিস্তানে মুজাহিদিন এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য।

ওয়াহাবিরা দাবি করে যে, আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদের বিশ্বাস তারা আন্তরিকভাবে করছে, এবং যে সমস্ত মুসলমানরা ছয় শতাধিক বছর ধরে শিরকের মধ্যে ডুবেছিল, এবং ওয়াহাবিরা কুফর থেকে থেকে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে, ওয়াহাবিরা সেই কুফর থেকে দূরে রয়েছে। নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য তারা সুরা আহকাফের পঞ্চম আয়াত এবং সুরা ইউনুসের ১০৬ আয়াতে কারীমকে পেশ করে থাকে। তবে কুরআনুল কারীমের সমস্ত তাফসীরকারক সর্বসম্মতিক্রমে এটি বলেছেন যে, এ দুটি আয়াত এবং আরও অনেক আয়াত মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে নাযিল করা হচ্ছে। এ আয়াতগুলোর প্রথমটি হল : সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্ব্ন্ধে অবহিতও নয়। অপরটি হলো : আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহবান করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদেরদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যাবে। "কাশফ আশ-শুবুহাত" শীর্ষক

বইটিতে সুরা যুমারের তিন নাম্বার আয়াতে কারীমা দিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, যা ঘোষণা করে : আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।" এ আয়াতে কারীমা মুশরিকদের, যারা মূর্তিপুজা করে। এখানে তাদের কথাগুলো-ই বর্ণনা করা হচ্ছে। এ বইটিতে যেসব মুসলমানরা মুশরিকদের নিকট শাফায়াতের চায় এবং উদ্দেশ্যমূলক এটা বলে , মুশরিকরা বিশ্বাস করে মূর্তিগুলো স্রষ্টা নয় বরং আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় "রুহুল বায়ান" গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হচ্ছে যে, "মানব জীবকে স্রষ্টাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে যে, তিনি তাদের এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি মানুষের জীব তাঁর সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করার এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আকুতি অনুভব করে।তবুও এ ক্ষমতা এবং আকাঙ্ক্ষা মূল্যহীন, নাফসের জন্য, কারণ শয়তান বা খারাপ সঙ্গীরা মানুষকে প্রতারিত করতে পারে, [এবং ফলস্বরূপ, এ সহজাত আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হবে] এবং মানুষ হচ্ছে যাবে [স্রষ্টায় অবিশ্বাসী অথবা কমিউনিস্টদের মতো] মুশরিক। একজন মুশরিক আল্লাহর কাছে যেতে পারে না, না সে তাঁকে চিনতে পারে। এমতাবস্থায় মূল্যবান জিনিস হলো মারিফা, এটা এমন জ্ঞান, যা নাস্তিকতা নির্মূল করতে পারে এবং তাওহিদ এর অন্তর্ভুক্ত করে। এর লক্ষণ হলো নবী-রসুলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা (আ.) এবং তাদের উপর নাযিলকৃত কিতাবে আস্থা এবং তাদের অনুসরণ করা। এটি হলো একমাত্র উপায় আল্লাহ তা'য়ালার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার। স্বয়ং শয়তানকে প্রাকৃতিকভাবে সিজদা করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে নফসের বশবর্তী হচ্ছে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। অনেক প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক নাস্তিক হচ্ছে ওঠে, কারণ তারা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিল নবী (দ) কে অনুসরণ না করেই। বরং তাদের যুক্তি আর নাফসের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়েছিল। মুসলিমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে যেতে এবং ইসলাম মান্য করতে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে; এভাবে তাদের অন্তরগুলো আধ্যাত্মিক আলোতে পূর্ণ হয়। আল্লাহ তা'য়ালার জামাল' (সৌন্দর্য) বৈশিষ্ট্য তাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।
মুশরিকরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে যাওয়ার জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম এর অনুসরণ না করে তাদের নাফসের অনুসরণ করতে থাকে। তাদের ত্রুটিযুক্ত এ এবং বিদয়াতের অনুসরণের কারণে তাদের অন্তর অন্ধকার হচ্ছে যায় এবং তাদের অন্তরের নুর দূর হচ্ছে যায় আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতের শেষে ঘোষণা দেন যে, তারা মিথ্যা বলে; যেমন তারা বলেড় আমরা মূর্তিপূজা করি এজন্য যে, তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। যেমন দেখা যায়, সূরা লোকমানের ২৫ তম আয়াত নেওয়া খুব অসমীচীন। এ আয়াতের বর্ণনায় দেখা যায়ড়যদি আপনি কাফেরদের জিজ্ঞাসা করেন, কে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছে?' তারা বলবে, অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা এগুলো তৈরি করেছেন, '।
সূরা আয যুখরুফ এর ৮৭ তম আয়াতে দেখা যায় যে, "আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে উপাসনা করে, এগুলো কে তৈরি করেছে?' তারা বলবে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা তৈরি করেছেন, ।
দলীল হিসেবে বলা হয় যে, মুশরিকরাও জানতো যে, স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা-ই ছিলেন। তারা প্রতিমাগুলোর উপাসনা করতো এ জন্, যাতে তারা তাদের জন্য বিচারের দিন সুপারিশ করতে পারে। এ কারণে তারা মুশরিক ও কাফের হয়েছিল।"[৫৩]
আমরা মুসলমানগণ, নবীগণকে আলাইহিস-সালাম 'বা আওলিয়া '' রহিমাহুম-আল্লাহু তা'য়ালা এর পূজা করি না। আমরা বলি না যে, তারা সহযোগী বা আল্লাহ তা'য়ালার সহযোগী বা অংশীদার। আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা সৃষ্টি এবং মানব ছিলেন এবং তারা ইবাদতের যোগ্য নন। আমরা বিশ্বাস করি, তারা আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দা, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রিয় বান্দাদের উসিলায় অন্য বান্দাদের দয়া করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই ক্ষতি এবং লাভ তৈরি করেন। তিনি একাই উপাসনার যোগ্য। আমরা বলি যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য ক্ষমা করেন তাঁর প্রিয়জনদের উসিলায়। মুশরিকদের জন্য; যদিও তারা তাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের দ্বারা বলে যে, তাদের প্রতিমাগুলো গৃজনশীল নয়। এবং তারা রাসুল (দ.) অনুসরণ করে তাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান তৈরি করেনি। তারা বিশ্বাস করে তাদের প্রতিমাগুলো উপাসনার যোগ্য এবং তাই তারা তাদের উপাসনা করে। যেহেতু তারা বলে যে, প্রতিমাগুলো উপাসনা করার যোগ্য; তাই তারা মুশরিক। অন্যথায় তারা মুশরিক হচ্ছে উঠত না এজন্য যে, তারা সুপারিশ চায়। তাই দেখা যায়, আহলে সুন্নাহদেরকে পৌত্তলিকদের সাথে তুলনা

---

[৫৩]. জামিল সিদ্দিক যাহাবী (রাহ.) একজন ইরাকি আলেম, তার রচিত কিতাব আল ফাজরু ফি রাদ্দি আলা মুনকিরিত তাওউয়াসুলি ওয়া কারামাতি ওয়াল খাওয়ারিক (১৩২৩ হিজরিতে প্রকাশিত) তিনি প্রমান করে দেখান যে, এ বই (কাশফুশ শুবুহাত)-এ আয়াতে কারীমার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জামিল সিদ্দিক ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল কালাম' বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি ১৩৫৫ হিজরি মোতাবেক ১৯৩৬ সালে ইন্তেকাল করেন।

করা সম্পূর্ণ ভুল। এইসব আয়াতসমূহকে মূর্তিপূজাকারী কাফের ও মুশরিকদের জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। কাশফ আশ-শুবহাত বইটি আয়াতগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দেয়, কুতর্ক করে এবং বলে যে, সুন্নি মুসলিমরা মুশরিক। এটা ওয়াহাবি নয় মুসলমানদের হত্যা করতে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে উৎসাহিত করে।
আবদুল্লাহ ইবনে' উমর (র.) দ্বারা উদ্ধৃত দুটি হাদীসে বর্ণিত আছেড় "তারা সঠিক পথ ছেড়েছে। তারা মুসলমানদের উপর আরোপিত করেছে এমন সব আয়াত যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল কাফেরদের জন্য। আমার উম্মতের জন্য আমার সমস্ত ভয় এজন্য যে, তাদের সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো কুরআনুল কারীমের মনগড়া ব্যাখ্যা সম্বলিত তাদের মিথ্যা অনুবাদ। এ দুটি হাদিসই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, লা মাযহাবী লোকের আবির্ভাব হবে। তারা কাফেরদের জন্য নাযিলকৃত আয়াত ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।
অন্য আরেকজন আলেম যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুহাম্মদ ইবনে 'আবদ আল-ওয়াহহাবের ভুল চিন্তাচেতনা আছে এবং এটা পরবর্তীতে ক্ষতিকর হচ্ছে উঠবে তখন যিনি তাকে ভুল সংশোধন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি হলেন শাইখ মুহাম্মদ ইবনে সুলায়ামান আল মাদানী রহ. (মৃত্যু ১১৯৪ হিজরি, ১৭৮০ সাল মোতাবেক, মদিনা)। তিনি ছিলেন মদিনার অন্যতম মহান আলেম এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ। তিনি অনেক বই লিখেছেন। ইবনে হাজার আল-মক্কী (রাহ) প্রতি তাঁর ভাষ্য তুহফাত আল-মুহতাজ ; মিনহাজ বইয়ের টীকা হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। তার মধ্যে আল-ফাতওয়া শিরোনামযুক্ত দ্বি-খণ্ডের বইটিতে তিনি বলেন, "হে মুহাম্মদ ইবনে' আবদুল আল-ওয়াহহাব! মুসলমানদের নিন্দা করবেন না! আমি আল্লাহ তা'য়ালার খাতিরে আপনাকে পরামর্শ দিছি। হ্যাঁ, যদি কেউ এটা বলে যে, আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কেউ কোন কিছু ঘটায়; তাহলে তাকে সত্যটা বলুন। তবে যারা ওসিলা গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে যে, ওসিলা এবং তাদের মধ্যে কার্যকর শক্তি উভয়ই আল্লাহ তা'য়ালা দ্বারা তৈরি ; তাহলে তাদের কাফের বলা যায় না। আপনিও একজন মুসলিম। একজন মুসলমান যে ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত আছে; তার জন্য সকল মুসলমানদের খারাপ বলার চেয়ে তাকে ধর্মবিরোধী' বলা আরও সঠিক হবে। যিনি এ দল ত্যাগ করেন তার সম্ভাবনা বেশি বিপথগামী হওয়ার। সূরা নিসার ১১৪ তম আয়াতে কারীমা আমার কথাটি সঠিক প্রমাণ করে। : যদি এমন কোনও ব্যক্তি, যিনি ইমামত শিখার পরে রাসুল (দ)র বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের থেকে, ঈমান এবং ইবাদাত থেকে বিচ্যুত হয়। তাহলে পরকালে আমি তাকে পুনরুত্থিত করব অবিশ্বাস ও ধর্মভ্রষ্টতায়, যার সাথে সে এ বিষয়ে অন্তরংজ্ঞ ছিল এবং আমি তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। যদিও ওয়াহাবীদের অগণিত ভুল উপাখ্যান রয়েছে তবে তা রয়েছে তিনটি নীতির ভিত্তিতে :
১. তারা বলে যে আমল বা ইবাদত ঈমান এর অন্তর্ভুক্ত এবং যে একটি ফরয এর উপর আমল করে না যদিও তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি ফরয। উদাহরণস্বরূপ, অলসতার কারণে নামাজ, কৃপণতার কারণে যাকাত আদায় না করলে সে কাফের হচ্ছে যায়, এবং তাকে হত্যা করতে হবে এবং তার সম্পত্তি অবশ্যই ভাগ এবং বিতরণ করতে হবে ওয়াহহাবীদের মধ্যে। আস সিরিস্তানি বলেন, "আহলে সুন্নার আলেমরা সর্বসম্মতিক্রমে বলেন, যে ইবাদত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।
যদি একজন মুসলিম ফরজ ইবাদতের একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন না করে অলসতার কারণে যদিও তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি সম্পাদন করা ফরজ, তবে তিনি কাফের হবেন না। সর্বসম্মততা হয়নি যারা নামাজ না করে তাদের সম্পর্কে; হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী, যেব্যক্তি অলসতার কারণে নামাজ আদায় ন করে না এমন ব্যক্তি কাফের হচ্ছে যায়।"[৫৪] [তেনুল্লাহ পানীপথি (রহ.) 'তাঁর বই মা-লা বুদ্দ এর শুরুতে বলেন, "একজন মুসলমান কবিরা গুনাহের কারণে কাফেরহয়ে ওঠে না। যদি তাকে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হয় তবে তাকে অচিরেই জাহান্নামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে অচিরেই বা পরেএবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তিনি থাকবেন চিরকাল জান্নাতে।" এ বইটি ফারসি ভাষায় এবং এটি মুদ্রিত হয়েছিল দিল্লী ১৩৭৬ হিজরিতে [১৯৯০সালে।] এবং ইস্তাম্বুলের হাকীকাত কিতাবেবী পুনরুৎপাদন করেছিল ১৪৪০ হিজরি [১৯৯০ সালে।]। হাম্বলি মাযহাবে, বলা হয়েছিল যে, যেব্যক্তি নামাজ আদায় করে না সে কাফের হচ্ছে যাবে। কিন্তু এ কথা অন্যান্য ফর্য কাজের বেলায় বলা হয়নি। সুতরাং, ওয়াহাবিদের হাম্বলি মাযহাবের দিক থেকে বিবেচনা করলে ভুল হবে। উপরে বর্ণিত হিসাবে, যে লোকেরা আহলে সুন্নার অন্তর্ভুক্ত নয় তারা হাম্বলি হতে পারে না।[৫৫] যাঁরা চারটি মাযহাবের কোনটির অন্তর্গত নয়, তারা আহলে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। ২. তারা বলে যে, যে ব্যক্তি রাসুল (দ.) অথবা আওলিয়াগন (রাহ.) থেকে শাফায়াত চাইবে অথবা যারা তাদের কবর জিয়ারত করে এবং তাদেরকে মধ্যস্তাকারী হিসেবে চিন্তাভাবনা

---

[৫৪]. আল-মিলিল ওয়া এন-নিহাল (তুর্কি), পৃ. ৬৩, কায়রো, ১০৭০ এএইচ।
[৫৫]. একই বিষয়ে তথ্যের জন্য মুসলিমদের জন্য উপদেশ বইটি দেখুন।

করে প্রার্থনা করে, তারা কাফের হচ্ছে যাবে। তারা বিশ্বাস করে মৃতদের কোনও বুদ্ধি নেই ।যদি একজন ব্যক্তি কবরে মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলে হল কাফের, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম ', মহান আলেমগণ ও আউলিয়ারা এভাবে প্রার্থনা করতেন না। আমাদের নবীরসাল্লাল্লাহু আলাইহি' আলাইহি ওয়া সাল্লাম ' এর উহুদ ময়দানে শহীদ হওয়া সাহাবিদের, মদিনার জান্নাতুল বাকী যিয়ারত করার অভ্যাস ছিল। এমনকি, এটা ওয়াহাবিদের কিতাব ফাতহুল মাজিদ ৪৮৫ তম পৃায় লিখিতযে তিনি (দ.) সালাম করলেন এবং তাদের সাথে কথা বললেন।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, 'সর্বদা তাঁর দোয়ার মধ্যে বলতেন, "আল্লহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিহাক্কিস সা-ইলিনা আলাইকা," (হ্যাঁ রাব্ব!) আমি আপনার কাছে চাই সেই লোকদের মাধ্যমে, তারা যাই চেয়েছিলেন আপনার কাছ থেকে তাই পেয়েছেন) এবং আমরা যেভাবে প্রার্থনা করি সেভাবে করার উতসাহ দিয়েছেন। যখন তিনি হযরত আলী (র.) মা ফাতিমা, (র.) কে হস্তক্ষেপ করলেন তাঁর নিজের আশীর্বাদযুক্ত হাত দিয়ে, তখন বললেন, "ইগফির লি-উম্মি ফাতিমাতা বিনতি আসাদ ওয়া ওয়াসসি' আলাইহা মাদখালাহা বিহাক্কি নাবিয়্যিকা ওয়াল আম্বিয়াইল লাযিনা মিন ক্বাবলি, ইন্নাকা আরহামার রাহিমীন। যখন তিনি হযরত আলী (র.) এর মাতা ফাতিমা (আঃ) কে তাঁর নিজের আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ইগফির লি-উম্মি ফাতিমাতা বিনতী আসাদ ওয়া ওয়াসি '' আলাইহ মদখালাহজ দ্বি-হক্কী অবিয়িকা ওয়া-এল-আনবিয়'-ইলাদহনা মিন কাবলি ইন্নাকা আরহামু-আর-রাহিমিন অর্থাৎ (হে প্রভু! আপনি মা ফাতিমা বিনতে আসাদের অপরাধকে ক্ষমা করুন! তার সম্মান অনেক প্রশস্ত! আপনার শেষ নবী এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ভালোবাসার উছিলায় আমার এ প্রার্থনা কবুল করুন। নিশ্চয় তুমি এক করুণাময়ের সর্বাধিক দয়ালু!) একটি হাদিস শরীফে উসমান ইবনে হুনাইফ (র.) রির্পোঁ করেছেন যে, জনৈক এক অন্ধ আনসারী রাসূল সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর নিকট নিরাময় থেকে পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইলে, নবী সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সে ব্যক্তিকে ওযূ করে এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি "আল্লহুম্মা ইন্নেস আস আসালুকা ওয়া আতওয়াজ্জাহু ইলাইকা দ্বি-নাবিয়্যাহিকা মুহাম্মদী-এন-নবিয়ী-আর-রহমা, ইয়া মুহাম্মদ ইন্নি আতওয়াজ্জাহু বিকা ইল্ল রাব্বা ফা হজাতি হাদিহি লি-তাকদিয়া ল, আল্লহুম্মা শফি'হু ফিয়া পড়তে আদেশ দিয়েছিলেন। এ অন্ধের প্রার্থনায় মুহাম্মদ সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম মধ্যস্তা কারী হিসেবে ছিলেন যাতে তাঁর প্রার্থনা কবুল হয়। সাহাবত আল-কিরাম প্রায়শই এ প্রার্থনাটি করতেন, যা আশি'আতিল লুমআতের নামক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত রয়েছে। তাছাড়া এটির সাথে রেফারেন্স স্বরুপ আল-হুসান ওয়াল-হাসান কিতাব যেখানে মূল উদ্দেশ্য রয়েছে :

আমি আপনার নবীর উছিলায়, আপনার দরবারে হাত তুলিয়াছি।

উপরোক্ত দোয়ার উদাহরণ গুলো এটিই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দাগণের উছিলায় কোন দোয়া কামনা করা জায়েয, অথার্ৎ এটি বলা বৈধ যে, তাদের ওয়াস্তে (উছিলায়)। জামে আল আজহারের প্রখ্যাত শায়খ আলি মাহফুজ, যিনি ১৩৬১ সালে [১৯৪২ খিষ্ট্রাব্দে] ইন্তেকাল করেন, তিনি তার ইবাদা গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া ও আবদুহুদের খুব বেশি প্রশংসা করেছেন। তবুও, তিনি একই বইয়ের দুইশত ত্রয়োদশ পৃায় উল্লেখ করেন যে, একথা বলা সঠিক নয় যে মহান আউলিয়া (রহ.) গণ মৃত্যুর পরেও পার্থিব কাজ সম্পাদন করা, যেমন– অসুস্থদের নিরাময় করা, ডুবন্ত ডুবুরিকে উদ্ধার করা, শত্রুর বিপক্ষে সাহায্য করা এবং হারিয়ে জিনিস খুঁজে দেয়ার মতো কাজ সম্পন্ন করেন। এটা বলা ভুল যে, কারণ আউলিয়াগণ খুব দুর্দান্ত, আল্লাহ তা'য়ালা এসব ক্ষমতা তাদের কাজের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন বা তারা যা চায় তা করতে পারে বা যে কোনও ব্যক্তি তাদের মেনে চলাও ভুল হবে না। তবে তারা জীবিত হোক বা না হোক, আল্লাহ তা'য়ালার আশীর্বাদ তার প্রিয় আউলিয়া কেরামের কারামতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন যেমন– অসুস্থদের নিরাময় করেন, যে সমস্ত লোক ডুবে যেতে চলেছে তাদের উদ্ধার করেন, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইকারীকে সহায়তা করে এবং হারানো জিনিস পুনরুদ্ধার করে। এটি যৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে কুরআনুল কারীম এ ঘটনাগুলো প্রকাশ করে"[৫৬] হযরত আবদুল গণী নাবুলুসী (রহ.) লিখেছেন : সহীহ বুখারীতে একটি হাদিসে কুদসী উদ্ধৃত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন যে, "আমার এমন কিছু বান্দা আছে যারা শুধু ফরজ আদায়ের মাধ্যমে আমার নৈকট্য তালাশ করে না, বরং নফল তথা অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। ফলে আমি তাদেরকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন সে যা শুনে তা আমার নিয়ন্ত্রণেই শুনে, চোখ দিয়ে যা দেখে তা

---

[৫৬]. শায়খ 'আল মাহফুজ, আল-ইবাদা পৃ. ২১৩, কায়রো, ১৩৭৫ সাল [১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ];জামি আল আজহার এর অধ্যাপক আবদুল্লাহ আদ-দাসাকি এবং ইউসুফ অ্যাড-দাজওয়ী আল-ইবদায়ের শেষে বইটির প্রশংসা করে প্রশংসা লিখেছিলেন।

আমার নিয়ন্ত্রণেই দেখে, তার হাত দিয়ে যা ধরে তা আমার নিয়ন্ত্রণেই ধরে, যখন সে হাঁটে তখন আমার নিয়ন্ত্রণেই হাঁটে এবং সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি।" ইবাদত তথা উপাসনার অতিরিক্ত (নফল) আমলের কথা এখানে বলা হচ্ছে [যেমনটি স্পষ্টভাবে মারাক্ক আল-ফালাহ এবং আত-তাহাত্বি কিতাবের টীকায় উল্লেখ আছে]।

তাদের দ্বারা-ই সুন্নাত ও নফল আমলসমূহ আদায় হয়ে থাকে, যারা ফরজ কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে। উক্ত হাদিসখানা এ বিষয়টা নির্দেশ করে যে, যে ব্যক্তি ফরয ইবাদতের পাশাপাশি আল্লাহর অতিরিক্ত উপাসনাও করে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং আল্লাহ তার ইবাদতসমূহ কবুল করবেন।"[৫৭]

জীবিত হোক কিংবা মৃত, যখন-ই এ শ্রেণির লোকেরা অন্যের জন্য তথা মানুষের জন্য প্রার্থনা করে তখন তাদের প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। এমন লোকেরা শুনতে পারেন; তাদের মারা যাওয়ার পরও। যারা তাদের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে তাদেরে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয় না, কারণ যখন তারা জীবিত ছিলেন তখনও তারা এমনটা করতেন না। সেজন্য, একটি হাদিস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে যে, "আপনি যখন কোন বিষয়ে সমস্যায় পতিত হবেন তখন যারা কবরে শায়িত আছেন তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন! এ হাদীসের শরীফের অর্থ পরিষ্কার এবং এর তালীল (অন্যভাবে ব্যাখ্যা কর.) অনুমোদিত নয়। বরং আলুসীর ব্যাখ্যা মিথ্যা।

প্রকৃতপক্ষে "মুসলমানরা মারা যাওয়ার পরেও মুসলমান থাকে বরং তখন তারা ঘুমায়। নবীগণও অনুরূপ নবী থাকেন মৃত্যুর পরেও বরং তারা ঘুমিয়ে আছেন; কারণ সেই আত্মা-ই যথাক্রমে একজন মুসলিম বা নবী। যখন একজন মানুষ মারা যায়, তার প্রাণ আর বেঁচে থাকে না। এ সত্য কথাটি ইমাম আব্দুল্লাহ আন নাসাফী (রহঃ)এর রচিত উমাদাতুল আকাইদ নামক বইটিতে লেখা আছে যেটি [১২৫৯ সালে (১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছিল।] তেমনিভাবে আউলিয়াগণও আউলিয়া রহ. হিসেবে থাকেন যদিও তারা মৃত্যুবরণ করেছেন বরং তারা ঘুমের একটা পর্যায়ে নিজেকে অগোচর করে পেলেন। যে এটিকে বিশ্বাস করে না করে, সে অজ্ঞ এবং একগুঁয়ে। আমি অন্য একটি বইতে প্রমাণ করেছি যে, আউলিয়াগণ তারা মারা যাওয়ার পরেও কারামতের অধিকারী হয়ে থাকেন।"[৫৮] হানাফি পণ্ডিত আহমদ ইবনে সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আল-মক্কী আল-হামায়ী ও শাফী পণ্ডিত আহমদ ইবনে আহমদ আস সুজা এবং মুহাম্মদ আশ শাওবা আল-মিসরী এমন একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন যাতে তারা প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, আউলিয়াগণ কারামতের অধিকারী, তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের কারামত অব্যাহত থাকে এবং তাদের কবরগুলোতে তাওয়াসুল বা ইসতিগাসা [দেখুন নীচে] এর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

কোনিয়ার মুহাম্মদ হাদেমী এফেন্দি (রহ.) (ডি ১১৭৬/১৭৬২ কোনিয়া) লিখেছেন : "আউলিয়াদের কারামত সত্য। ওলী এমন একজন মুসলিম, যিনি আরিফু বিল্লাহ (যিনি আল্লাহকে জানেন) এবং তাঁর যতটুকু সম্ভব তাঁর গুণাবলীসমূহ সম্পর্কে জানেন)। তিনি প্রচুর ইবাদত ও তায়া'ত (আনুগত্য) সম্পাদন করে থাকেন। তিনি খুব সাবধানে পাপ এবং কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্ট জিনিসগুলো তাঁর কার্যবিধির আইন এবং বৈজ্ঞানিক আইনগুলোকে খারিকুল আ'দা' (বিস্ময়কর) বলা হয়।

এগুলো আট ধরণের : মুজিযা, কারামত, ইয়া'না, ইহানা, সেহর, ইবতিলা, ইসবাত আল-আইন (চোখের বিভ্রান্তি) এবং ইরাহাস। কারামত একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা একজন অনুগত বিশ্বাসীর দ্বারাই সম্ভব, যিনি আল্লাহ সম্পর্কে ভালো জানেন, যাকে ওলী বলা হয়; নবী নয়। শাফেয়ী পণ্ডিত ইসহাক ইব্রাহিম আল-ইসফারিনি কারামতের কিছু ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছে আর মুতাজিলা সম্প্রদায় পুরো কারামতকেই অস্বীকার করে থাকে।[৫৯] তারা বলেছিল যে, এটি মুজিযার বিশ্বাসের সাথে বিভ্রান্ত হতে পারে এবং নবীদের উপর বিশ্বাসও কঠিন হচ্ছে উঠতে পারে। যদিওবা একজন ওলী, যার কোন কারামত প্রকাশ পায়, তিনি নবুয়তি দাবী করেন না এবং নিজেও এমন কার্যকলাপ সম্পাদন করতে চান না।[৬০]

---

[৫৭]. আব্দুল্ গণী নাবুলুসী, আল-হাদিকত আন-নাদিয়া, পৃ. ১৮২, ইস্তাম্বুল,১২৯০।

[৫৮]. আল-হাদিকত আন-নাদিয়া, পৃ. ২৯০।

[৫৯]. যে লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস রয়েছে তাদের মুতাজিলা বলা হয়।

[৬০]. আল্লাহ তা'আলা সব কিছুকে একটা আইন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যাকে (আদত-ই-ইলাইহি) বলা হয়। মাঝেমধ্যে তিনি তাঁর এই আদত-ই- ইলাইহি ব্যতিক্রম করে থাকেন এবং একটি অস্বাভাবিক উপায়ে আশ্চর্য বা দুর্দান্ত ঘটনার মাধ্যমে তাঁর কার্য সম্পাদন করেন; যাতে করে তার প্রিয় বান্দারা আশ্চর্যান্বিত হয়। যখন একটি অলৌকিক ঘটনা একজন নবীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় একে মুজিযা বলা হয়। যখন একজন ওলীর (এমন ব্যক্তি যাদের আল্লাহ ভালোবাসেন) মাধ্যমে সংঘটিত হয় একে বলা হয় কারামাত। তবে মনে রাখা উচিত যে, তিনি মাঝেমধ্যে তার শত্রুদের মাধ্যমেও অলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে থাকেন আর এই ধরনের অলৌকিক ঘটনাকে ইস্তিদরাজ বলা হয়। আল্লাহ তায়াল বলেনড় তিনি তাঁর শত্রুদের আরও খারাপ করতে ইস্তিদরাজ সংঘটিত করে থাকেন।

সুতরাং আল্লাহর কাছে নবী-রাসূলগণ ও আউলিয়াগনের উছিলায় দোয়া প্রার্থনা করা বৈধ। কারণ তাদের মুজিযা এবং কারামত মৃত্যুর পরেও থেমে থাকে না। এ ধরণের প্রার্থনাকে তাওয়াসুল' বা ইসতিগাসা' বলা হয়।' আর-রামলিও একই কথা বলেছেন। ইমাম আল-হারামাইন বলেন, কেবল শিয়ারা মৃত্যুর পরে কারামতের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে। মিশরের একজন বিখ্যাত মালেকী পণ্ডিত আলী আযুহুরী (রহ.) বলেন, একজন ওলী কাঁটা তলোয়ারের মতো জীবিত থাকে। তার প্রভাব তার শস্যের কাঁটা তলোয়ারের মতো আরও কার্যকর হচ্ছে যায়। এ বিবৃতিটি আবু আলী সানজী তার লিখিত "নূর আল হেদায়া" নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেন। তাছাড়া এটি আলোকিত গ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারীম, সুন্নাহ ও ইমামগণের ইজমা দ্বারা স্বীকৃত যে, কারামত সত্য। আউলিয়াগণের শত শত হাজার হাজার কারামতের বিভিন্ন মূল্যবান বইয়ের প্রতিবেদন করা হচ্ছে।[৬১] "বারিকা" কিতাবের অনুবাদ এখানেই শেষ হলো।

হাদিস বিশেষজ্ঞ ইবনে হুযাইমা, দারু কুতনী এবং তাবারানী রহ. বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (র.) হতে একটি সহীহ হাদিস বর্ণনা করেন যে, নবি করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যারা আমার রাওজা যিয়ারত করতে আসবে তাদের জন্য জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব। ইমাম আল মানাভীও কুনাজ-আদ-দাকারিকে হাদিসখানা উদ্ধৃত করে। তাছাড়া হাদিস শরীফে তিনি আরো লিখেছিলেন; যেটি ইবনে হিব্বান থেকে প্রণীত যে, নবি করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রাওজা যিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবিত অবস্থায়-ই আমার সাথে সাক্ষাত করলো। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

অপর আরেকটি হাদীসে রয়েছে যেটি আত তাবরানী হতে সংকলিত, নবি করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি আমার রাওজা যিয়ারতকারী ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করব। নিম্নলিখিত হাদিস দুটি মারফু; যার প্রথমটি ইমাম আল-বাজজার দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি সহীহ মুসলিম দ্বারা সংকলিত এবং উভয়টি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (র.) কর্তৃক প্রণীত।

আরকটি হাদিস যা প্রায় প্রত্যেক মুসলমান জানেন তা হলো, রাসূল সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেন : আমার রাওজা যিয়ারতকারীদের জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য বৈধ এবং এটা আমার জন্য উচিত হচ্ছে গেছে যে, যারা আমার মদিনায়ে মনোয়ারাতে ভ্রমন করতে আসে তাদের জন্য সুপারিশ করা।[৬২] এটা অনেক বড় একটি সুসংবাদ যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছেড় যেব্যক্তি হজ্ব সম্পন্ন করার পর আমার কবর যিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবিত অবস্থাতে-ই আমার সাক্ষাৎ করলো।" হাদিসটি তাবরানী, আদ-দারু কুতনী এবং [আব্দুর রহমান] ইবনে জওযী বর্ণনা করেন। আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছেড় যেব্যক্তি হজ্জ আদায়ের পর কোন অজুহাত না থাকা সত্ত্বেও আমার যিয়ারত করলো না, যে যেন আমাকে আঘাত করলো।" হাদিসটি আদ-দারু কুতনী বর্ণনা করেন।

মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আবদুল আজিজ "তাহকীক ওয়া ইদহা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, উপরের কবর যিয়ারত সম্পর্কিত হাদিসগুলোর কোনটির কোন সমর্থন বা সনদ নেই। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া বলেন যে, সবাগুলোই মাওদু (জাল)। যাইহোক, সেগুলোর সনদ যুরকানীর আল-মাওয়াহিব গ্রন্থের অষ্টম খণ্ড এবং আস সামুদীর ওয়াফা আল ওয়াফা গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের শেষের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

এই বইগুলোতে এটাও লেখা রয়েছে যে, উপরোল্লিখিত হাদিসগুলো হাসান।[৬৩] আর ইবনে তাইমিয়ার এ মন্তব্য ভিত্তিহীন। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এবং প্রশিক্ষকরা আহলে সুন্নাতের আলেমদের জ্ঞানকে বিদ্রুপ করে তাদের লিখিত বইগুলোর মাধ্যমে ওহাবিয়্যতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাছে। যাতেকরে তারা নিজেদেরকে মুসলিম ও অমুসলিম জাতির নিকট সত্যিকারের মুসলমান প্রমাণ করতে পারে, তারা একটি নতুন পলিসি অনুসরণ করছে, তারা রাবিতাত আল-আলাম আল ইসলামি নামে মক্কায় একটি ইসলামি কেন্দ্র প্রতি করেছে এবং ধর্মীয় শিক্ষার নামে বিভিন্ন দেশ হতে অজ্ঞ ও ঘৃণ্য পুরুষদের একত্রিত করে তাদেরকে শত শত স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ বেতনের ব্যবস্থাও করেছে। ধর্মীয় পদযুক্ত এ অজ্ঞ পুরুষদের আহলে সুন্নাহ'র বিদ্বানদের গ্রন্থ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই বরং তারা পুতুলের মতো ব্যবহৃত হয়। তাদের এ কেন্দ্র থেকে তারা তাদের উপকরণগুলো ছড়িয়ে য়ে, যেটি পুরো মুসলিম বিশ্বের একক ফতোয়া কেন্দ্র" হিসেবে বিবেচিত। ১৩৯৫ সালের রমযানের সময় জালিয়াতিযুক্ত ফতোয়ায়১৯৭৫] খ্রিষ্টাব্দ] তারা বলেছিল যে, "নারীদের জন্য জুমার নামাজ আদায়

---

[৬১]. বুখারী, পৃ: ২৬৯

[৬২]. মিরাত আল-মদিনা (মিরাত আল হারমাইন) পৃ. ১০৬.

[৬৩]. অনুগ্রহ করে হাদিসের প্রকারসমূহ জানার জন্য উহফষবং নষরং নামক কিতাবের দ্বিতীয় পরিছদের ষ অধ্যায়টি দেখুন।

করা ফরজ। জুমআ ও ইদের খুতবা প্রতিটি দেশের স্থানীয় ভাষায় প্রদান করা যাবে।" মক্কায় ফেতনা ও ফাসাদ কেন্দ্রের একজন সদস্য, মওদুদী মতবাদের অনুসারী সাবরি নামক এক লোক তাৎক্ষণিকভাবে ভারতে গিয়ে এ ফতোয়াটি ছড়িয়ে দেয় এবং সেখানকার বেতনভোগী, ধনী ও অজ্ঞ লোকেদের সহায়তায় মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধ্য করে এবং বিভিন্ন ভাষায় খুতবার প্রচলন শুরু করে।

এই কর্মকাণ্ড রোধে ভারতের আহলে সুন্নাহর সত্যিকার আলেমরা গুরুত্বপূর্ণ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফতোয়া প্রনয়ণ করেন এবং সবার মাঝে ছড়িয়ে নে। ওহাবিরা এ ফতোয়ার সত্যতা খণ্ডন করতে পারেনি। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে দক্ষিণ ভারতের কেরালার শত শত পুরুষ বুঝতে পেরেছিল যে, তারা প্রতারিত হয়েছিল পরে তওবা করলেন এবং আহলে সুন্নাহ'র পথে ফিরে এলেন। চারটি নির্ভরযোগ্য উৎসের উপর ভিত্তি করে ফতোয়াগুলো প্রণয়ন করা হয়, যা অফসেট ও প্রিন্টেড প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত করে সমস্ত ইসলামি দেশে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক দেশের ইসলামি বিশেষজ্ঞ উলামারা মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ইসলামের মধ্যে বিভক্তি (ফেরকাবাদী) দূর করতে সক্ষম হোন। বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তের নির্দোষ ও সজাগ মুসলিম যুবকরা যে মিথ্যা হতে সত্যকে আলাদা করতে পেরেছে এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত হচ্ছে; সেজন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া। জুমআর খুতবা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়য়ের ব্যাখ্যা, তাকবীরে ইফতিতাহ ও নামাজের বিভিন্ন বিষয়ে ইবনে আবেদীন (রহ.) তাঁর রাদুল মুহতার কিতাবে বিস্তারিত লিখেছেন। আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা দেয়াটা নামাজের শুরুতে তাকবীরে ইফতিতাহ (আল্লাহু আকবর) অন্য ভাষায় দেয়ার মতই। তাকবীরে ইফতিতাহ হলো নামাজের যিকিরের মতো আর নামাযে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় যিকির ও দোয়া পাঠ করা মাকরূহে তাহরিমা; যেমনটি হযরত ওমর (র.) নিষিদ্ধ করেছেন। নামাজের ওয়াজিব অধ্যায়ে তিনি লিখেছিলেন : নামজে মাকরূহে তাহরীমা করা একটি ছোট গুনাহ। যদি কেউ এ ধরণের ভূল ক্রমাগত করতো থাকে তাহলে সে আদালা হারাবে।[৬৪]

আত তাহত্বাবি-তে লিখিত আছে, যেব্যক্তি ক্রমাগত এরূপ ছোটখাট পাপ করে সে ফাসিক হচ্ছে যায় এবং এটির জন্য মুসল্লীর উচিত অন্য কোনো মসজিদে যাওয়া। তার যাওয়াটা (জামাতে) নামাজ আদায়ের জন্য নয় বরং ইমাম ফাসিক বা বিদাআত সম্পন্নকারী হওয়ার কারণে। আরবি ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবার কোন অংশ কিংবা পুরো খুতবা পড়া মাকরূহ তথা বিদ'আত, যা মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবে' তাবেঈন (রহিমাহুমুলাহু তা'য়ালা আজমাইন) গণও সর্বদা পুরো খুতবা আরবিতে-ই পড়তেন, যদিও এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ শ্রোতাদের আরবি ভাষা সম্পর্কে কোন জ্ঞান-ই ছিলো না এবং বুঝতেও পারতো না। যদিওবা ধর্মীয় জ্ঞান সবখানে ছড়িয়ে পড়েনি এবং তাদেরকে সেভাবে শেখানোও হয়নি তথাপি তারা পুরো খুতবা আরবিতে-ই পড়তেন। এ কারণে ছয়শত বছরের অটোমান শায়খুল ইসলামবৃন্দ এবং বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত মহান মুসলিম স্কলাররা যদিও গুরুত্ব সহকারে চেয়েছিলেন যে, খুতবা তুর্কি ভাষায় পড়া হোক যাতে সকলমণ্ডলী এর বিষয়বস্তু বুঝতে পারে; কিন্তু এটি অনুমতি দেয়া হয়নি, কারণ তারা জানত যে, খুতবা তুর্কি ভাষায় হওয়া জায়েয নয়। ইমাম আল-বায়হাকী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি হাদিস শরীফে রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত, নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যখন কেউ আমার উপর দরূদ পেশ করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা আমার দেহে আমার প্রাণ দেন এবং আমি তাঁর দরূদ শুনতে পাই। এ হাদিসের উপর নির্ভর করে ইমাম আল-বায়হাকী (রহ.) বলেছেন যে, নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) আমাদের অজানা জীবনে তাদের স্ব-স্ব কবরে জীবিত রয়েছেন। অধিকন্তু, মদিনার আব্দুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ এ হাদিসটি উদ্ধৃত করে তাঁর আল-হজ্জ ওয়াল উমরা গ্রন্থের ৬৬ তম পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেন যে, এটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুকে প্রকাশ করে। তবুও, ভিতরে একই পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে, তিনি (রাসূল সাল্লাললল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) তাঁর কবরে জীবিত আছেন যেটি আমাদের কাছে অজানা। তার বক্তব্যগুলো একটি অপরটির সাথে মতবিরোধপূর্ণ। বাস্তবিকপক্ষে এ হাদিসে শরীফ ইঙ্গিত দেয় যে, তাঁর বরকতময় রূহ তাঁর শরীরে ফেরত দেওয়া হচ্ছে এবং তিনি উম্মতের প্রেরিত দরূদ ও সালামের জবাব দিয়ে থাকেন। তাছাড়া একই বইয়ের ৭৩তম পৃষ্ঠায় দুটো হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, তা হলোঃপ্রত্যেকের কবর জেয়ারতের সময় বলা উচিত যে আস-সালামু আলাইকুম আহল আদ-দিয়রি মিনাল-মুমিনীন।" এ হাদিসটি আমাদেরকে সমস্ত মুসলমানদের কবরে সালাম প্রেরণের বিষয়ে আদেশ করছে। লা-মাযহাবীরাও এ হাদিসটি স্বীকার করে থাকে। অথচ তারা দাবি করে যে, মৃতরা শুনতে পায় না এবং তারা এও বলে থাকে যে, যারা বিশ্বাস করে মৃতরা শুনতে পায়; তারা মুশরিক। তারা আয়াত ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদিস রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাললল্লাহু আলাইহি

---

[৬৪]. আদালা' মানে হলো ন্যায়বিচার'। অর্থাৎ তিনি ধর্মীয় বিষয়ে অবিশ্বস্ত হয়ে উঠবেন এবং তাকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হবে না।

ওয়াসল্লাম অনন্তকাল তাঁর কবরে জীবিত। অসংখ্য হাদিস এটি প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করেছে। নিম্নলিখিত হাদিস দুটি বহুল পরিচিত; যা সিহাহ্ সিত্তাহ্ কিতাবে বর্ণিত হচ্ছে : "আমার কবরের নিকট দরূদ পেশ করা হলে আমি তা শুনতে পাই এবং যারা দূর থেকে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।" যদি কোন ব্যক্তি আমার কবরে দরূদ পেশ করে, আল্লাহ তা'য়ালা একজন ফেরেশতার প্রেরণের মাধ্যমে আমাকে এ দরূদ সম্পর্কে অবহিত করেন। আর আমি বিচার দিবসে তার জন্য সুপারিশ করবো।[৬৫] কোন মুসলিম যদি মৃত মুসলমানের কবরে যায়, যাকে তিনি জীবিত অবস্থায় চিনতেন এবং তার কবরে গিয়ে যখন তাকে সালাম দেন তখন মৃত মুসলিম তার সালামের উত্তর দেন। ইবনে আবিদ দুনিয়া কর্তৃক উদ্ধৃত একটি হাদিস শরীফে তিনি বর্ণনা করেন যে, একজন মৃত মুসলিম সালাম প্রদান করা ব্যক্তিকে চিনেন, সেই ব্যক্তির সালামের উত্তর দেন এবং তিনি খুশি হোন। যদি কোনো ব্যক্তি মৃত মানুষকে সালাম জানায় যাকে তিনি চিনতেন না, তারাও শান্তিপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের সালামেরও জবাব দেয়। যদি উত্তম মুসলমান এবং শহীদ (রাহিমাহুমুল্লাহু তা'য়ালা) কবরে থাকার সময় যারা তাদের সালাম জানাছেন তাদের চিনতে এবং উত্তর দিতে পারেন, তাহলে রাসূল সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কেন সক্ষম হবেন না? আকাশের সূর্য যেমন পুরো বিশ্বকে আলোকিত করে, তেমনি তিনিও (রাসুল) সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম একসাথে সমস্ত সালামের উত্তর প্রদান করে থাকেন।[৬৬]

একটি হাদিস শরীফে রাসূল সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামইরশাদ করেছেন : "আমি জীবিত অবস্থায় যেভাবে শুনতে পাই, আমার ওফাতের পরেও ঠিক একইভাবে শুনতে পাবো। আবু ইয়ালার উদ্ধৃত আরেকটি হাদিস শরীফে বর্ণিত আছেড় "নবী-রাসূল (আঃ) গণ তাঁরা তাদের কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁরা স্ব-স্ব রওজায় নামাজ আদায় করেন। ইব্রাহিম ইবনে বিশার এবং সায়্যিদ আহমদ আর-রিফায়ীসহ আরও অনেক আউলিয়া (রহ.) বলেছেন যে, তাঁরা রাসূল সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কে সালাম দেওয়ার পরে রাওজা থেকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তর শুনতে পেয়েছেন।

বিশিষ্ট মুসলিম স্কলার হযরত জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী (র.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এটা কি সত্য যে সাইয়্যিদ আহমদ আর-রেফায়ী রসুল (দ.) এর পবিত্র হাত মুবারকে চুম্বন করেছিলেন?" এ প্রশ্নের জবাব তিনি তাঁর শরফ আল মুহকাম' গ্রন্থে প্রদান করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি যুক্তিসংগত ও নির্ভরযোগ্য দলীল সহকারে প্রমাণ করেন যে, রসুল (দ.) অকল্পনীয়ভাবে তাঁর রওজা মোবারকে জীবিত আছেন। তিনি শুনতে পান এবং সালামের জবাব দেন। এ গ্রন্থে তিনি আরো ব্যাখ্যা করেন যে, মে'রাজের রাতে রসুল (দ.), মূসা (আ.) কে তাঁর কবরে নামাজ আদায় করতে দেখেছেন।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফে বলা হচ্ছে, "আমি খায়বারে ভক্ষণকৃত বিষাক্ত মাংসের বিষের ব্যথা অনুভব করছি। এ বিষের কারণে এখন আমার ধমনী কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।" এ হাদিস শরীফ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রে মানব হযরত মুহাম্মদ (দ.) কে নবুয়তের পাশাপাশি শাহাদাতের মর্যাদাও প্রদান করেছেন। সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে তাদের তোমরা কখনোই মৃত বলো না; বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত রয়েছে। তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হবে।" এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর রাস্তায় বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়া রসুল (দ.) আয়াতে বর্ণিত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে সর্বশ্রে।

ইবনে হিব্বান উদ্ধৃত একটি হাদিস শরীফে বলা হচ্ছে, "নবীগণের পবিত্র দেহসমূহের কখনো ক্ষয় হয় না। কোনো মুসলিম যদি আমার উপর দরূদ পাঠ করে, একজন ফেরেশতা সেই দরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেন এবং বলেন, অমুকের পুত্র অমুক আপনার উপর দরূদ পাঠ করেছে ও আপনার কাছে সালাম পেশ করেছে।"

ইবনে মাজাহ'য় বর্ণিত একটি হাদিস শরীফে আছে,"তোমরা জুমার দিনে আমার উপর বেশি বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করো। কেননা দরূদ পাঠের সাথে সাথে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।" সেই সময়ে রসুল (দ.) এর সাথে থাকা সাহাবীগণের একজন হযরত আবু দারদা (রা.); রসুল (দ.) কে জিজ্ঞেস করলেন, "মৃত্যুর পরও কি তা আপনার নিকট পৌঁছানো হবে?" রসুল (দ.) উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, আমার মৃত্যুর পরও আমাকে তা জানানো হবে। নবীগণের শারীর ভক্ষণ ভূপৃরে জন্য হারাম।" "মৃত্যুর পরও তারা জীবিত এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হবে।" [এই হাদিস শরীফটিও সানা উল্লাহ পানিপথী'র মওত ওয়াল কুবূর' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। এ গ্রন্থটি ফারসি ভাষার এবং ১৩১০ হিজরি সালে (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) দিল্লীতে মুদ্রিত হয়। ১৯৯০ সালে হাক্বীকত কিতাবেভী কর্তৃক ইস্তাম্বুলে এর অনুলিপি তৈরি করা হয়।]

---

[৬৫]. (নামায নির্ধারিত) সালাত নিম্নরূপ: "আল্লহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলে সাইয়্যাদিনি মুহাম্মাদ।

[৬৬]. কবরস্থানে যাওয়ার সময় কীরূপ আচরণ করা উচিত; সে সম্পর্কে তথ্যের জন্য দয়া করে উহফষবং ইষরং নামক বইয়ের পঞ্চম ফ্যাসিকের (পরিছদ) সতেরোতম অধ্যায়টি দেখুন।

হযরত ওমর (রা.) জেরুজালেম বিজয়ের পর রসুল (দ.) এর রওজা মোবারকে যান, তাঁর রওজা যিয়ারত করেন এবং তাঁকে সালাম পেশ করেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রা.), যিনি একজন মহান ওলী ছিলেন, তিনি দামেস্ক থেকে মদিনায় তার কর্মকর্তাদের পাঠাতেন এবং তাদের মাধ্যমে রসুল (দ.) এর রওজা মোবারক এ দরূদ ও সালাম পেশ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তার প্রত্যেক সফরের শেষে সরাসরি হুজরাত-এ-সা'দা'য় চলে যেতেন। প্রথমে তিনি রসুল (দ.) এর রওজা যিয়ারত করতেন এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এবং তার পিতার মাযার যিয়ারত করতেন এবং তাদের সালাম পেশ করতেন। ইমাম নাফী (রা.) বলেন, "আমি ১০০ বারেরও বেশি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কে রওজা মোবারকে যেতে এবং আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ' বলতে দেখেছি। একদা হযরত আলী (র.) মসজিদ আশ-শরীফ' এ প্রবেশ করলেন এবং যখন হযরত ফাতেমা (রা.) এর রওজা দেখতে পেলেন, তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি হুজরাত আস-সা'দায় গিয়ে আরো বেশি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর আসসালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ' এবং আসসালামু আলাইকুম হে আমার ভ্রাতৃদ্বয়' বলে নবী করীম (দ.), হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.) এর প্রতি সালাম পেশ করলেন।"

ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) এর মতে, "প্রত্যেকের উচিত প্রথমে হজ্জ সম্পাদন করা। তারপর মদিনা মনোয়ারায় যাওয়া এবং রসুল (দ.) এর যিয়ারত করা।" এ কথাটিই আবুল লাইস আস-সমরকন্দী রহ. এর ফতোয়ায় লেখা রয়েছে।

শিফা' গ্রন্থপ্রণেতা কাযী আয়ায, শাফেয়ী মাযহাবের আলেম ইমাম নববী, হানাফি আলেম ইবনে হুমাম (র.) বলেনড় এ ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য হচ্ছে যে, রসুল (দ.) এর রওজা যিয়ারত করা অত্যাবশ্যাক। কতিপয় আলেম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, রসুল (দ.) এর রওজা যিয়ারত করা সুন্নাহ, যেমনটি ওয়াহাবিদের ফাতহুল মাজিদ' কিতাবেও লেখা রয়েছে।

সূরা আন-নিসার ৬৩ নং আয়াতে বলা হচ্ছে, "যদি তারা নিজেদের নফসের প্রতি অবিচার করার পর আপনার নিকট আসে এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যদি আমার রাসুল তাদের হচ্ছে ক্ষমা চায়, তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহ তা'য়ালাকে তওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসেবে পাবে।" এ আয়াতে করীমা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে, রসুল (দ.) সুপারিশ করবেন এবং তাঁর সুপারিশ কবুল করা হবে। এটা আমাদের দূর-দূরান্ত হতে এসে রসুল (দ.) এর রওজা যিয়ারত করা এবং তাঁর সুপারিশ প্রার্থনা করার নির্দেশও দেয়।

একটি হাদিস শরীফে আছে, "তিনটি মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত হতে যাত্রা করা জায়েজ।" এ হাদিসটি ইঙ্গিত দেয় যে, মক্কার মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদ আন-নববী এবং জেরুজালেম এর মসজিদ আল-আকসা যিয়ারতের জন্য দূর দূরান্ত হতে সফরের মধ্যে সওয়াব রয়েছে। এ কারণেই যে সমস্ত মুসলিম হজ্জ আদায় করতে যায় কিন্তু মসজিদ আন-নববীতে রসুল (দ.) এর রওজা যিয়ারত করতে যায় না, তারা এ পুরস্কার হতে বঞ্চিত হবে।

হযরত ইমাম মালেক (র.) এর মতে, যারা রওজা যিয়ারত করতে যায়, তাদের জন্য দীর্ঘদিন হুজরাত আস-সা'দার নিকট অবস্থান করা মাকরূহ। ইমাম জয়নুল আবেদীন (র.) যিয়ারতের সময় রওজা আল-মুতাহহারা'র পাশের স্তম্ভটির কাছে দাঁড়াতেন এবং তিনি এর বেশি অগ্রসর হতেন না। হযরত আয়েশা (রা.) এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত হুজরাত আস সা'দা'র দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্বিবলামুখী হচ্ছে যিয়ারত করা হতো।

একটি হাদীসে এসেছে, "তোমরা আমার রওজাকে উৎসবের স্থান বানিও না।" হাদিসবিশারদ হযরত আব্দুল আজিম আল-মুনযিরী এভাবে এ হাদীসের ব্যাখ্যা দেন, "ঈদের দিনের মতো তোমরা বছরে একবার আমার রওজা যিয়ারতকে যথে মনে করো না। বারংবার আমার রওজা যিয়ারতের চেষ্টা করো।" "তোমরা তোমাদের বাড়িকে কবরে পরিণত করো না", এ হাদীসে বুঝানো হচ্ছে-আমাদের বাড়িতে নামাজ না পড়ার মাধ্যমে বাড়িকে কবরের মত বানিয়ে ফেলা উচিত নয়। তাই হযরত আল-মুনযিরীর ব্যাখ্যাটি সঠিক। বাস্তবিকপক্ষে, কবরে নামাজ আদায় করা অনুমতিসিদ্ধ নয়। বলা হচ্ছে, এ হাদিস শরীফে এটা বুঝানো হয় যে "আমার রওজা যিয়ারতের জন্য উৎসবের মতো নির্দিষ্ট দিন বেছে নিও না।" ইহুদি এবং খ্রিষ্টানরা তাদের নবীদের কবর পরিদর্শনের সময় স্বভাবত একত্রিত হচ্ছে বাদ্যযন্ত্র বাজায়, গান গায় এবং অনুান উদযাপন করে। আলোচ্য হাদিসটি ইঙ্গিত করে, আমাদের তাদের মতো এসব করা উচিত নয়; অর্থাৎ রওজা যিয়ারতের সময় আমাদের আনন্দ করা কিংবা উৎসবের দিনের নিষিদ্ধ কাজ করা অথবা বাদ্যযন্ত্র বাজানো বা অনুান পালনের জন্য সমাগম হওয়া উচিত নয়। আমাদের উচিত রওজা যিয়ারত করা, সালাম পেশ করা ও দোয়া করা এবং সেখানে দীর্ঘসময় অবস্থান না করে চুপচাপভাবে চলে যাওয়া। ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) বলেন, রওজা মোবারক যিয়ারত করা সর্বোত্তম

সুন্নাহ এবং কোনো কোনো আলেম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। এইজন্য শাফেয়ি মাযহাবে রওজা যিয়ারতের মানত করা জায়েজ।[৬৭]

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বাণী, "যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে কিছুই সৃষ্টি করতাম না"[৬৮] দ্বারা নির্দেশ করেন যে, মুহাম্মদ (দ.) হলেন আল্লাহর হাবিব তথা প্রিয় বন্ধু। এমনকি একজন সাধারণ মানুষও তাঁর হাবীবের উসিলায় কিছু চাইলে নিরাশ হবে না। আশেকের কাছে তাঁর প্রিয়জনের জন্য যেকোনো কিছু করাই সহজ। যদি কেউ বলে,"হে আল্লাহ! তোমার মুহাম্মদ (দ.) এর উসিলায় আমি তোমার কাছে চাইছি", তার এ ইছা প্রত্যাখ্যাত হবে না। তবে তুচ্ছ পার্থিব বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ওসীলা হিসেবে রসুল (দ.) এর নাম নেয়া উচিত নয়।[৬৯]

ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) বলেন, "আমি মদিনায় ছিলাম। সালেহীনদের একজন শায়খ আয়্যুব আশ-শাহতিয়ানী মসজিদ আশ-শরীফে প্রবেশ করলেন। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। হযরত শায়খ রওজা মোবারকের মুখোমুখী হলেন এবং ক্বিবলাকে পেছনে দিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি বের হচ্ছে আসলেন।" হযরত ইবনে জামা'আয়া তার "আল-মানসাক আল-কবীর" গ্রন্থে লিখেছেন, "যিয়ারতকালে দুরাকাত নামায আদায় ও মিম্বরের নিকটে দোয়া করার পর তোমাদের উচিত হুজরাত আস-সা'দার পাশে ক্বিবলার দিকে আসা এবং রসুল (দ.) এর মাথা মোবারক বামদিকে রেখে মারকায শরীফ (রসুল (দ.) এর রওজা) এর দেয়াল হতে দুমিটার দূরে অবস্থান করা; এরপর ক্বিবলার দেয়ালকে পেছনে রেখে এবং ধীরে ধীরে মুওয়াজ্জাহাত আস-সা'দার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রসুল (দ.) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা। চার মাযহাবে এরকমই রয়েছে।"

আব্দুল গনী আন নাবুলুসী (র.) জিহবা দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়' এর ২৩তম ব্যাখ্যায় লিখেছেন, রসুল (দ.) এর সত্যতা বা (অমুক অমুক জীবিত বা ওফাতপ্রাপ্ত) ওলীর সত্যতার দোহাই দিয়ে দোয়া করা কিংবা এসব বলে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া মাকরূহে তাহরিমী। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর উপর কোনো সৃষ্টির কোনো অধিকার নেই; অর্থাৎ কারো ইছাপূরণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়। এটাও সত্য যে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের অঙ্গীকার দিয়েছেন এবং তাঁর উপর তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন; অর্থাৎ, তিনি তাদের ইছা পুরণ করবেন এ স্বীকৃতি। তিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর উপর তাঁর বান্দাদের অধিকার দিয়েছেন, উদাহরণস্বরূপ "আমার উপর আবশ্যক মুমিনদের সাহায্য করা।"[৭০] ফাতওয়ায়ে বাযযাযিয়াতে বলা হচ্ছে, "রসুল (দ.) এর উসিলায় অথবা মৃত বা জীবিত ওলীর উসিলায় তাঁর নাম ধরে কিছু চাওয়া জায়েজ।" শিরা' এর ব্যাখ্যায় আছে, "রসুল (দ.) বা খাঁটি মুমিনদের উসিলা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত। এ বিষয়টি "আল-হিসন আল-হাসীন" গ্রন্থেও লেখা রয়েছে। যেমন দেখা যায়, মুসলিম আলেমগণ বলেনড় আল্লাহ কর্তৃক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দেয়া অধিকার এবং ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর কাছে দোয়া করা জায়েজ। আর কোনো আলেম এ কথা বলেননি যে, আল্লাহর উপর মানুষের অধিকার রয়েছে এ ধারণার মাধ্যমে দোয়া করা শিরক এর শামিল। শুধুমাত্র ওয়াহাবিরা এমনটা বলে থাকে। যদিও তারা "ফাতহুল মাজিদ" এর "ফতোয়ায়ে বায্যাযিয়া" এর প্রশংসা করে এবং তার ফতোয়াকে দলীল হিসেবে পেশ করে, তথাপি এ ক্ষেত্রে তারা তার বিরোধিতা করে। জিহ্বা দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়' এর ব্যাখ্যায় আল হাদিমীও লেখেন, "আপনার নবীর অধিকার বা ওলীর অধিকার বলতে বুঝায় তাঁর নবুয়ত বা বেলায়তের সত্যতা'। আমাদের নবী করীম (দ.)ও এ নিয়তে বলতেন, "আপনার নবী মুহাম্মদ (দ.) এর উসিলায়।" এবং যুদ্ধের সময় তিনি মুহাজিরদের মধ্যে দরিদ্রদের উসিলায় আল্লাহর সাহায্য চায়তেন। এমন অনেক মুসলিম বিজ্ঞ আলেম আছে, যারা দোয়া করতেন, যারা আপনার কাছে যা চেয়েছেন তাই তাদের দেয়া হচ্ছে এমন লোকদের উসিলায়'' এবং মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী'র উসিলায়'' আর তারা এ দোয়াগুলো তাদের বইয়েও লিখেছেন।[৭১] "আল-হিসন আল-হাসীন" এ বইটি এ ধরণের দোয়ায় পরিপূর্ণ। তাফসীরে রুহুল বয়ানে সূরা আল-মায়েদা'র ১৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে, হযরত ওমর ফারুক (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছেড় "যখন আদম (আ.) ভুল করলেন তখন তিনি বললেন : হে আমার রব! মুহাম্মদ (দ.) এর উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেনড় আমি তো এখনো মুহাম্মদ (দ.) কে সৃষ্টি করিনি, তুমি তাকে কিভাবে চিনলে?' তিনি (আদম) বললেন, হে আমার রব! যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং

---

[৬৭]. Endless Bliss এর পঞ্চম সংস্করণ এর পঞ্চম ও ষ চ্যাপ্টার দেখুন; ৩য় খণ্ড, ১২২তম পত্র।

[৬৮]. এই হাদীসে কুদসীটি ইমাম আর-রব্বানী (র.) এর মাকতুবাত গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

[৬৯]. মির'আত আল মদীনা, পৃ. ১২৮২।

[৭০]. আল-হাদিক্বা।

[৭১]. হাদিমী, বেরিক্বা, ইস্তাম্বুল, ১২৮৪

আমার মধ্যে রূহ দিলেন, আমি উপরে দৃষ্টিপাত করেছি এবং আরশের প্রান্তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলাল্লাহ; কালেমা লিখিত দেখেছি। আপনি আপনার সবচেয়ে প্রিয় বান্দার নাম-ই আপনার পাশে লিখতে পারেন। এটা ভেবেই আমি বুঝেছি যে, আপনি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, হে আদম! তুমি সত্য কথা-ই বলেছো। আমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তাই আমি তাঁর উসিলায় তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি মুহাম্মদ (দ.)ই না থাকত, তবে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।" এ হাদিসটি ইমাম বায়হাকীর "দালায়েল" এবং ইমাম আলূসীর "গালিয়্যা" গ্রন্থে বর্ণিত হচ্ছে।

"ফাতহুল মজিদ" গ্রন্থটিতে ওয়াহাবি লিখেছে, "ইমাম জয়নুল আবেদীন আলী (র.) এক ব্যক্তিকে রসুল (দ.) এর রওজার পাশে নামায প্রার্থণা করতে দেখলেন এবং তিনি এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে বাঁধা দিলেন যে, আমার উপর দরূদ পেশ করো; যেখানেই তোমরা থাকো না কেন। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়'। তারা এ ঘটনাটি ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং আরো বলে : "তাই দরুদ প্রেরণ ও দোয়া করার জন্য কবরের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ, যা কবরস্থানকে উৎসবের স্থান বানানোর সদৃশ। যারা মসজিদ আন-নববীতে নামাজ আদায় করতে যায়, তাদের জন্য সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে গম্বুজের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ। কোনো সাহাবাই এমনটা করেননি এবং যারা এমন করতে চেয়েছে তাদেরকে তারা বাঁধা দিয়েছেন। কেননা উম্মতের দরূদ ও সালাম রসুল (দ.) এর নিকট পৌঁছানো হয়।"[৭২] তিনি আরো লিখেছেন যে, সৌদি সরকার মসজিদ আন-নববীতে রসুল (দ.) এর রওজার পাশে সেনা মোতায়েন করেছে মুসলিমদের এসব কাজ থেকে বাঁধা দেয়ার জন্য।[৭৩]

হযরত ইউসুফ আন-নাবহানী তার বইয়ের অসংখ্য জায়গায় এসব জালিয়াতির খণ্ডন করেছেন : "ইমাম জয়নুল আবেদীন (র.) ; রসুল (দ.) এর রওজা যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি; বরং তিনি যিয়ারতের সময় অনৈসলামিক ও অসম্মানজনক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তার পৌত্র ইমাম জাফর সাদিক হুজরাত আস-সা'দা যিয়ারত করতেন এবং রওজায়ে মুতাহহরা এর পার্শ্বের স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করতেন এবং বলতেন–তাঁর মাথা মোবারক এ পাশে রয়েছে', আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিয়ো না' অর্থাৎ উৎসবের দিনের মত নির্দিষ্ট কিছু দিনে আমার রওজা যিয়ারত করো না। সাধারণভাবেই আমার রওজা যিয়ারত করো।"[৭৪] "আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী তার আত-তাযকিরাতে লিখেছেনড় "রসুল (দ.) এর উম্মতের কার্যাবলী প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। "খলিফা মনসূর রসুল (দ.) এর রওজা মোবারক যিয়ারতকালে ইমাম মালিক (র.) কে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি গম্বুজমুখী হবো না ক্বিবলামুখী?' ইমাম মালিক (র.) বলেন, আপনি কীভাবে রসুল (দ.) এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন?' তিনিই আপনার এবং আপনার পিতা আদম (আ.) এর ক্ষমাপ্রাপ্তির কারণ'। "হাদিস শরীফ তোমরা কবর যিয়ারত করো' এটি একটি আদেশ। যদি যিয়ারতের সময় কোনো হারাম কাজ করা হয়, তাহলে যিয়ারত নয়, ঐ হারাম কাজটিই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। "(পৃ. ৯২) "ইমাম নববী তার ইযকার' কিতাবে বলেছেনড় বারংবার রসুল (দ.) এর রওজা ও পুণ্যবান মুসলিমদের মাযার যিয়ারত করা এবং যিয়ারতের এ স্থানগুলোতে কিছু সময় অবস্থান করা সুন্নাহ" (পৃ. ৯৮)। "ইবনে হুমাম তার "ফাতহুল কাদির" গ্রন্থে দারু কুতনী ও আল বাজ্জার হতে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেনড় যদি কেউ শুধুমাত্র আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার রওজা যিয়ারত করে, অন্যকিছু করার জন্য নয়, তবে কেয়ামত দিবসে সে আমার সুপারিশের অধিকার রাখবে' (পৃ. ১০০)। "আল্লাহ তা'য়ালা আউলিয়া কেরামগণকে ক্বারামত দ্বারা ভূষিত করেছেন। তাদের মৃত্যুর পরও তাদের ক্বারামতসমূহ প্রত্যক্ষ হয়। তারা মৃত্যুর পরও সাহায্য করতে সক্ষম। আল্লাহর কাছে তাদের সুপারিশের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে-ই তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। আমি যা অনুরোধ করি, তা-ই যদি তুমি দাও বা আমার অসুস্থ আত্মীয়কে সুস্থ করে দাও, তবে আমি তোমাকে এত পরিমাণ দেব' এরূপ বলা জায়েজ নেই, যা অজ্ঞতাবসত প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। যাইহোক, এটা কোনোভাবেই কুফরী বা শিরক বলে বিবেচিত হবে না; এজন্য যে, ওলী কিছু সৃষ্টি করতে পারেন; এমনটা কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিও আশা করে না। বরং সে ওলীকে আল্লাহর সৃষ্টির উসীলা হিসেবেই চাই। সে মনে করে, ওলী এমন একজন মানুষ যাকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং বলে, আল্লাহকে বলো আমি যা চাই তা পূরণের মাধ্যমে আমাকে অনুগ্রহ করতে; তিনি তোমার দোয়া অগ্রাহ্য করবেন না'। বস্তুত, রসুল (দ.)

---

[৭২]. ফাতহ আল-মজিদ, পৃ. ২৫৯; এই বইয়ের জন্য উপরের ৫৩নং পৃা দেখুন।

[৭৩]. ইবিদ, পৃ. ২৩৪।

[৭৪]. শাওয়াহিদুল হক্ব, পৃ. ৮০। ৩য় সংস্করণ, কায়রো, ১৩৮৫ [১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ]। পরবর্তী ছয়টি উক্তিও পৃা নং সহ এই বইয়ে উল্লেখিত।

বলেছেন, এমন অনেক লোক রয়েছে যাদেরকে নিম্ন ও অযোগ্য ভাবা হয়, কিন্তু তারাই আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দা। যখন তারা কিছু করতে চায়, আলাহ তা'য়ালা অবশ্যই তা করে দেন'।[৭৫] এ হাদিস এর ভিত্তিতেই মুসলিমরা আউলিয়া কেরাম এর সুপারিশ কামনা করে। ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) এর মতে, পুণ্যবান ব্যক্তিদের (ওলীগণের) মাযারের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা জায়েজ। যারা নিজেদের আহলে সুন্নাহ বা আহলে সুন্নাহর যেকোনো একটি মাযহাবের অনুসারী বলে, তারা অবশ্যই এ ইমামগণের মতো বলবে। অন্যথায়, আমরা তাদেরকে সুন্নী নয় বরং মিথ্যাবাদী হিসেবে বিবেচনা করবো। [পৃ. ১১৮]
অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়' সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া' তে লেখা রয়েছে : "কোনো ইবাদতের সওয়াব অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া জায়েজ। তাই নামাজ, রোযা, যাকাত, হজ্জ, কুরআনুল করীম তেলাওয়াত; নবীগণ (আ.), শহিদ, আউলিয়া কেরাম ও সালেহ মুসলিমদের কবর যিয়ারত; মৃতের কাফন এবং সমস্ত সদকা ও ভালো কাজের সওয়াব উৎসর্গ করা যায়।" এ থেকে বুঝা গেল যে, আউলিয়া কেরামের মাযার যিয়ারতেও সওয়াব রয়েছে।
এখন অবধি যা লেখা হয়েছে, সেসবের দলিল আমাদের আরবি ও ইংরেজি বইগুলোতে দীর্ঘাকারে লেখা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সকল মুসলিমকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দৃঢ় মনোভাব সম্পর্কে জানতে হবে এবং উপরোক্ত বইয়ে আহলে সুন্নাহর বিশিষ্ট আলেমগণ যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা বিশ্বাসের মাধ্যমে সত্যের পথে একত্রে এগিয়ে আসতে হবে। নবী করীম (দ.) বলেছেন, একমাত্র সঠিক পথ হবে আহলে সুন্নাহ'র পথ। আমাদের আহলে সুন্নাহ'র ঐক্যবদ্ধতা থেকে দূরে সরে না যাওয়ার জন্য এবং ধর্মীয় পদাসীন অজ্ঞ ব্যক্তি যারা ধর্মীয় বইয়ে ব্যবসা করে তাদের প্রতারণামূলক লেখা বা ধর্মান্ধ ব্যক্তি যারা মুসলিমদের ধোঁকা দিতে চায় তাদের লেখা গ্রহণ করার ব্যাপারে অবশ্যই খুবই সতর্ক থাকতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আন-নিসার ১১৪ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে, "যারা মুসলিমদের ঐক্যের বিরোধিতা করে তারা জাহান্নামে যাবে।" এ সকল দলীল-প্রমাণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসারী নয়, তারা নিজেদের আহলে সুন্নাহ'র ঐক্যবদ্ধতা থেকে পৃথক করে নিয়েছে এবং এ ধরনের লা-মাযহাবী ব্যক্তি ধর্মত্যাগী বা অমুসলিম হচ্ছে যাবে।[৭৬]
"আত-তাওয়াসসুলু বিন নবী ওয়া জাহালাত আল ওয়াহাবিয়্যিন" গ্রন্থে উদাহরণ ও দলীল সহকারে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইবনে তাইমিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ থেকে সরে গিয়েছে। ওয়াহাবি ধর্মমত হলো ইবনে তাইমিয়ার ধর্মদ্রোহিতা ও বৃটিশ গুপ্তচর হেম্পারের মিথ্যা ও অপবাদের সংমিশ্রণ।[৭৭]
ওয়াহাবিরা বলে," কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, যারা মাযারে ইবাদত করে ও মাযারের খেদমত করে তাদের জন্য বাতি জ্বালানো, মৃতদের জন্য মানত করা কুফরী এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হারমাইন শরীফ (মক্কা ও মদিনা) এর বাসিন্দারা এখন অবধি গম্বুজ ও প্রাচীরের উপাসনা করেছে।"
জাঁকজমক ও অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হারাম। যদি তা কবরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য হয় তবে তা মাকরূহ। যদি মনে করা হয় কোনো চোর বা প্রাণী কবরে প্রবেশ করবে, তবে তা জায়েজ। কিন্তু এটাকে দর্শনের স্থান বানানো উচিত নয় অর্থাৎ কারো বলা উচিত নয় যে, নির্দিষ্ট সময়ে তা পরিদর্শন করতে হবে। পূর্বনির্মিত কোনো ভবনে মৃতদেহ দাফন করা মাকরূহ নয়। সাহাবায়ে কেরাম রসুল (দ.) এবং দুই খলিফা (রা.) কে একটি ঘরে-ই দাফন করেছিলেন। কেউ এটার বিরুদ্ধে যায়নি। হাদিস শরীফে এসেছে যে, তাদের (সাহাবায়ে কেরামের) সর্বসম্মততা ধর্মবিরোধের ভিত্তিতে হতে পারে না। বিখ্যাত ইসলামি ব্যক্তিত্ব ইবনে আবেদিন লিখেছেন "কতিপয় আলেম এর মতে, ধার্মিক মুসলিম বা আউলিয়া কেরামের কবরের উপর কাপড় আছাদন, বা পাগড়ি রাখা মাকরূহ।" "ফতোয়া আল-হুজ্জা" গ্রন্থে বলা হয়েছে, কবরকে কাপড় দ্বারা আবৃত করা মাকরূহ। কিন্তু যদি এর দ্বারা কবরে শায়িত ব্যক্তির মাহাত্ম্য দেখানো কিংবা অপমানিত হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করা অথবা যিয়ারতকারিদের শ্রদ্ধাশীল ও সদাচরণকারী হওয়ার স্মরণ করানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তা আমাদের কাছে মাকরূহ নয়। আদিল্লায়ে শরীয়ত-এ তা নিষিদ্ধ নয়; এমন কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট নিয়তের ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে সাহাবায়ে কেরামের সময়ে কবরের উপর কোন গম্ভুজ কিংবা কারুকার্যমন্ডিত মাযার নির্মিত হয়নি, কবরের উপর কাপড়ও রাখা হয়নি। কিন্তু তাদের কেউই একটি রুমে রসুল (দ.) ও

---

[৭৫]. এই হাদীসটি "ফাতহুল মজিদ" গ্রন্থের ৩৮১ নং পৃায় উল্লেখ রয়েছে।

[৭৬]. প্রখ্যাত আলেম আহমদ আত-তাহতাভীর "খাশিয়াতু দুর আল-মুখতার" এবং "আল-বাসাইর আ'লাল মুনিকিরিত-তাওয়াসসুলি বিল-মাক্বাবির" যা "ফাতহুল মজিদ"র খণ্ডন হিসেবে পাকিস্তানে লেখা হয়েছিল এবং ইস্তাম্বুলে পুনঃমুদ্রণ হয়েছিল।

[৭৭]. Confession of a British Spy নামক বইটি দেখুন, যা হাকীকত কিতাবেভী, ফাতিহ, ইস্তম্বুল, তুর্কি-তে আছে।

শায়খাইন (তাঁর পরবর্তী দুই খলিফা) এর দাফনের ব্যাপারে বিরোধিতা করেননি। "তোমরা কবরের উপর হাঁটাহাঁটি করোনা" ও "তোমরা মৃত ব্যক্তিদের অসম্মান করোনা" এ আদেশের কারণ এবং তা মেনেই তারা বিরোধিতা হতে মুক্ত ছিলেন। আর এসব যেহেতু নিষিদ্ধও ছিল না, তাই শুধুমাত্র পরবর্তী প্রজন্ম এসবের চর্চা করার কারণে এসব বিদ'আত হতে পারে না। ফিকহের কিতাবসমূহে আছে, ক্বাবা মুয়াজ্জামার প্রতি সম্মান বজায় থাকার খাতিরে বিদায়ী তাওয়াফের পর মসজিদে হারাম ত্যাগ করা জরুরি। যাইহোক, সাহাবায়ে কেরামের এরকম করতে হতো না। কারণ তারা সর্বদাই ক্বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবে পরবর্তী প্রজন্ম যথাযথ সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের আলেমগণ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, পিছন হেঁটে মসজিদ ত্যাগ করে সম্মান দেখানো জরুরি। এভাবেই তারা আমাদের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্ভব করেছিলেন। তেমনিভাবে, সাহাবায়ে কেরামের মত শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্যই সালেহীন ও আউলিয়া কেরামের কবরকে কাপড় দিয়ে ঢাকা বা তাদের কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা জায়েজ করা হয়েছিল। প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার আব্দুল গনী আন-নাবুলুসী তার "কাশফ আন-নূর" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[৭৮] আরব দেশে মাযার কে বলা হয় মাশহাদ'। মদিনা মুনাওয়ারায় জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে অনেক মাশহাদ ছিল। লা-মাযহাবীরা সেসব ধ্বংস করে দিয়েছিল। কোনো ইসলামি বিশেষজ্ঞই বলেননি যে, গম্বুজযুক্ত মাযার নির্মাণ বা যিয়ারত করা কুফরি বা শিরক। কাউকেই মাযার ধ্বংস করতে দেখা যায়নি।

ইব্রাহীম আল-হালাবী আল-কাবীর' নামক কিতাবের শেষে লিখেছেন : "যদি কেউ সিদ্ধান্ত নেয় যে, তার জমিতে কবরস্থান হবে এবং যদি সেখানে খালি জায়গা থাকে, তবে মৃতদেহ দাফনের উদ্দেশ্যে সেখানে গম্ম্বুজযুক্ত কবর তৈরি করা জায়েজ। যখন কোনো খালি জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না, এ গম্বুজযুক্ত কবরটি ভেঙে ফেলা হবে এবং ওই স্থানে কবর খোড়া হবে। এটা কবরস্থান নির্মাণের জন্য দাতব্য, ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত জায়গা হওয়ায় এরূপ হবে।" যদি গম্বুজযুক্ত সমাধি নির্মাণ করা শিরক হিসেবে পরিচিত হতো বা যদি গম্বুজযুক্ত সমাধিগুলো মূর্তি হিসেবে বিবেচিত হতো, তবে তা ধ্বংস করা সবসময়ের জন্য প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর বুকে অবস্থিত প্রথম ইসলামিক সমাধি হলো হুজরাত আল-মুয়াত্তারা, যেখানে রসুল (দ.) কে সমাহিত করা হচ্ছে। ১১ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার দুপুরের পূর্বে আমাদের রসুল (দ.) তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী, আমাদের মা হযরত আয়েশা (রা.) এর কক্ষে ইন্তেকাল করেন। বুধবার রাতে সেই কক্ষেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.) কেও ওই কক্ষে সমাহিত করা হয়। কোনো সাহাবী-ই এর বিরোধিতা করেননি। এখন সাহাবীদের এ সর্বসম্মততার বিরোধিতা করা হচ্ছে। যদিও সন্দেহজনক দলীল এর অপব্যাখার মাধ্যমে ইজমা' আল উম্মাহ তথা আলেমগণের ঐক্যমতকে অস্বীকার করা কুফরী নয়, তথাপি এটা বিদ'আত।

হযরত আয়েশা (রা.) এর কক্ষটি ছিল তিন মিটার উঁচু, তিন মিটারের কিছু বেশি দীর্ঘ ও প্রশস্ত এবং রোদে শুকানো ইটের তৈরি। এটির দুটি দরজা ছিল, একটি পশ্চিমমুখী এবং অন্যটি উত্তরমুখী। হযরত ওমর (রা.) খলিফা থাকাকালীন হুজরাত আস-সা'দাকে নিচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও দিয়ে দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) যখন খলিফা হলেন, তিনি ওই প্রাচীরটি নষ্ট করে ফেলেন এবং কালো পাথর দ্বারা তা পুনঃনির্মাণ করেন ও সুন্দরভাবে প্লাস্টার করে দেন। এ প্রাচীরটির উপরে কোনো ছাদ ছিল না এবং উত্তরদিকে একটি দরজা ছিল। ৪৯ হিজরিতে হযরত হাসান (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন তাঁর শেষ ইছার প্রয়োজনে তাঁর ভাই হযরত হোসাইন (রা.) তাঁর মৃতদেহ হুজরাত আস-সা'দার দরজার কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং দোয়া ও সুপারিশের জন্য তাঁর মৃতদেহটি মাযারের ভিতর নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; তাঁর মৃতদেহ সেখানে দাফন করা হবে ভেবে কিছু মানুষ এর বিরোধিতা করেছিল। তাই কোলাহল প্রতিরোধে মৃতদেহ মাযারে নেয়া হয়নি আর তাঁকে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। এধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আবার ঘটার আশংকায় ওই কক্ষের দরজা এবং বাইরের একপাশে দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছিল। ৬ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ যখন মদিনার গভর্নর ছিলেন, ওই রুমের চারপাশে দেয়াল তুলে দেন এবং ছোট্ট একটি গম্বুজ দিয়ে রুমটি ঢেকে দেন। ৮৮ হিজরিতে (৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) যখন তিনি খলিফা হলেন, তিনি তার পরবর্তী গভর্নর ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে মসজিদ আশ-শরীফ সম্প্রসারণের আদেশ করেন; অতঃপর দ্বিতীয় একটি প্রাচীর দিয়ে কক্ষটি ঘেরাও হল। এটা ছিল পঞ্চভুজাকৃতির ও ছাদযুক্ত এবং সেখানে কোনো দরজা ছিল না।[৭৯]

---

[৭৮]. ইবনে আবেদীন, হাশিয়াতু দুর আল-মুখতার (রাদ আল-মুহতার) পৃ. ২৩২, ৫ম খণ্ড, বুলাক্, ১২৭২; কাশফ আন-নূর এবং জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী (র.) এর তানবীর আল-খলক ফি ইমকানি রু'ইয়াতিন নবী জিহারান ওয়াল মালাক একত্রে আল মিনিতার আল ওয়াহাবিয়্যা নামে ১৩৯৩ হিজরিতে [১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ] ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়।

[৭৯]. বিস্তারিত আলোচনার জন্য Advice for the Muslim এর ১৫ নং আর্টিকেলটি দেখুন।

ওয়াহাবীদের ফাতহুল মজিদ গ্রন্থে বলা হচ্ছে, "যে ব্যক্তি কোনো গাছ, পাথর, কবর কিংবা তদ্রুপ কিছুর মাধ্যমে বরকত হাসিলের ইছা করে, সে মুশরিক হচ্ছে যায়। কবরগুলোর উপর গম্ভুজ নির্মাণ করায় সেগুলোকে ভাস্কর্য বানানো হচ্ছে। জাহেলিয়া যুগের মানুষেরাও ধার্মিক ব্যক্তির ও মূর্তির পূজা করতো। বর্তমানে মাযার ও কবরগুলোতে এধরনের এবং এর চেয়ে জঘন্য কার্যকলাপ চলছে। ধার্মিক ব্যক্তিদের কবরের মাধ্যমে বরকত লাভের চেষ্টা করা মূর্তি আল-লাতের[৮০] উপাসনা করার মতোই। এ মুশরিকরা মনে করে যে, আউলিয়াগণ শুনতে পান ও তাঁদের প্রার্থনার জবাব দেন। তারা বলে যে, তারা মানত ও কবরের জন্য সদকা করে মৃতদের কাছে পৌঁছায়। এ সমস্ত আমল হচ্ছে শিরকের প্রধান ক্ষেত্র। একজন মুশরিক নিজেকে অন্য কিছু বললেও সে মুশরিকই। তারা নিজেদের যাই বলুক না কেন শ্রদ্ধা ও আদবের সাথে মৃতদের কাছে প্রার্থনা করা, পশু জবাই করা, মানত করা এবং এ ধরনের অন্যান্য কার্যাবলী শিরকের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানের মুশরিকরা তাযীম' ও তাবারুক' শব্দ ব্যবহার করে বলে যে তাদের এ সমস্ত কাজ জায়েজ। তাদের এ ধারণা মিথ্যা।"[৮১]

আমরা ইতিমধ্যে মুসলিম আলেমদের দেয়া আহলে সুন্নাহ'র মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ ধরনের আপত্তিকর ব্যঙ্গ কথার জবাবগুলো অনুবাদ করেছি এবং সেগুলো আমাদের বিভিন্ন বইয়ে লিখেছি। নিচে আল উসূল আর আরবাআ ফি তারদীদ আল ওয়াহাবিয়্যা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদ সজাগ পাঠকদের দেখানোর জন্য অনুবাদ করা হচ্ছে যে, ওয়াহাবিরা নিজেরাই নিজেদের প্রতারণা করেছে এবং মুসলিমদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে : কুরআনে করীম, হাদিস শরীফ, সালফে সালেহীনদের কথা ও কাজ এবং অধিকাংশ আলেম প্রমাণ করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে সম্মান প্রদর্শন করা জায়েজ। সূরা আল হজ্ব এর ৩২নং আয়াতের সারকথা হলো, যখন কেউ আল্লাহ তায়লার শায়া'য়ীর এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। তাই আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হয়ে গেল।" শায়া'য়ীর' এর অর্থ হলো চিহ্ন ও নিদর্শন'। আব্দুল হক দেহলবী (র.) বলেন, শায়া'য়ীর' হলো শায়ীরা' এর বহুবচন, যার অর্থ নিদর্শন। যা কিছু আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাই আল্লাহর নিদর্শন'। সূরা আল বাকারার ১৫৮ নং আয়াতের মূলকথা হলো, সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্গত। এ আয়াত থেকে বুঝা গেল গেল যে শুধুমাত্র সাফা ও মারওয়া পাহাড় আল্লাহর নিদর্শন নয়, এছাড়াও অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর শুধুমাত্র "আরাফা', মুযদালিফা' ও মিনা' এ স্থানগুলোকেই আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায় না (আরো অনেক নিদর্শন রয়েছে)।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ আদ-দেহলভী (র.) তার "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" এর ৬৯ পৃায় বলেন, আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশ্রে নিদর্শন হচ্ছে কুরআনুল করীম, কাবা আল-মুয়াযযামা, নবী করীম (দ.) এবং নামাজের পদ্ধতি। আর তার "আলতাফ আল-কুদস" গ্রন্থের ৩০ নং পৃষ্ঠায় শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, আল্লাহর নিদর্শনকে ভালোবাসা মানেই কুরআনুল করীম, নবী করীম (দ.), কাবাকে ভালোবাসা অথবা আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয় এমন যেকোনো কিছুকে ভালোবাসা। আল্লাহ তা'য়ালার আউলিয়াগণকে ভালোবাসাও অনুরূপ'।[৮২] মক্কায় মসজিদ আল হারামের নিকটে অবস্থিত সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়, যেখানে হযরত ইসমাইল (আ.) এর মা হযরত হাজেরা (আ.) হেঁটেছিলেন, এ দুটি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম এবং এগুলো যেকাউকে সৌভাগ্যবান মা এর কথা মনে করিয়ে দেয়; তাহলে সৃষ্টির সেরা ও আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (দ.) যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন ও বেড়ে উঠেছেন, যেখানে তিনি ইবাদত করেছেন, যেখানে হিজরত করেছেন, নামাজ আদায় করেছেন, ইন্তেকাল করেছেন ও তাঁর পবিত্র রওজা মোবারক, তাঁর পরিবারবর্গের (তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এ আহলে বায়ত) ও সাহাবায়ে কেরামের জায়গাগুলো কেন আল্লাহর নিদর্শন বলে গণ্য হবে না? কেন তারা এসব ধ্বংস করে?

"যখন মনোযোগ সহকারে ও নিরপেক্ষভাবে কুরআনুল করীম তেলাওয়াত করা হয়, তখন সহজেই দেখা যায় যে অনেক আয়াত রসুল (দ.) এর প্রতি সম্মান প্রকাশ করে। সূরা আল-হুজরাত এ এসেছে, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ.) এর সম্মুখে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী (দ.) এর কণ্ঠের চেয়ে উঁচু স্বরে কথা বলো না। তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাকো তাঁকে সেভাবে ডেকো না। এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হচ্ছে যাবে। যারা আল্লাহর নবী (দ.) এর সম্মুখে তাদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, আল্লাহ তা'য়ালা

---

[৮০]. প্রাক ইসলামি তথা জাহেলিয়্যা যুগে আরবদের উপাসনার একটি প্রধান মূর্তি।

[৮১]. ফাতহুল মজিদ, পৃ. ১৩৩।

[৮২]. যেহেতু নবী করিম (দ.) বলেছেন, যখন আউলিয়াদের সাক্ষাৎ লাভ হয়, তখন আল্লাহর কথা স্মরণে আসে', যা ইবনে আবি শাইবা'র মুসনাদ, ইরশাদ আত-তালিবীন এবং কুন্যু আদ-দাক্বাইক্ব এ বর্ণিত হয়েছে; এই হাদীস শরীফটি বুঝায় যে, আউলিয়া কেরামও আল্লাহর নিদর্শন। জামি উল ফাতওয়াতে লেখা হয়েছে, সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আউলিয়া ও ইসলামী স্কলারদের কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ জায়েজ।

তাদের অন্তর তাকওয়া দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন; তিনি তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন ও তাদের অসংখ্য পুরস্কার দেন। যারা তাঁকে ঘরের বাইরে থেকে ডাকে, তারা তো নির্বোধ; তাদের জন্য উত্তম হলো তিনি বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। যারা এ পাঁচটি আয়াত ভালভাবে পড়ে ও নিরপেক্ষভাবে ভাবে, তাদের কাছে স্পষ্ট যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয়নবী (দ.) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে কত প্রশংসা করেছেন এবং কতটা গুরুত্বসহকারে উম্মাহকে তাঁর রসুল (দ.) এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর গুরুত্বের মাত্রা এ বিষয়টি দ্বারা বিচার করা যেতে পারে যে, যারা তাঁর চেয়ে উচুস্বরে কথা বলে তাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ হচ্ছে যাবে। এ আয়াতগুলো বনী তামিম গোত্রের ৭০ জন লোক, যারা মদিনায় অশোভনভাবে চিৎকার করে রসুল (দ.) কে ডাকাডাকি করেছিল তাদের শাস্তির বিধান হিসেবে নাযিল হয়েছিল। বর্তমানে কিছু লোক নিজেদের বনী তামীম গোত্রের বংশধর বলে থাকে। এটা অবশ্যই তাদের জন্য যে, রসুল (দ.) তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে নজদ অঞ্চলের [আরব উপদ্বীপে] দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, প্রাচ্যে হিংসাত্মক ও অত্যাচারী লোকেরা রয়েছে' এবং শয়তান সেখান থেকে বিভ্রান্তি জাগিয়ে তুলবে। কিছু লা-মাযহাবীরা হলো নজদী, যারা নজদ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। উপর্যুক্ত হাদীসে উল্লেখিত বিভ্রান্তি বারো শত বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল : তারা নজদ থেকে হেজাযে এসে মুসলামানদের সম্পত্তি লুন্ঠন করে, পুরুষদের হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের দাস-দাসী বানিয়ে রাখে। তারা কাফেরদের চেয়েও জঘন্য কাজ করেছিল।

"এছাড়াও এ আয়াতে পুনরাবৃত্তি উক্তি হে ঈমানদারগণ' বুঝায় যে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সকল কালের সমস্ত মুসলিমকে রসুল (দ.) এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল-বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। যদি এ নির্দেশ কেবলমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জন্য হতো, তবে হে সাহাবীরা' বলা হতো। প্রকৃতপক্ষে, হে নবীর স্ত্রীগণ' এবং হে মদিনার অধিবাসী' এইগুলো কুরআনের উক্তি। একই ধরনের বাক্যাংশ হে ঈমানদারগণ' বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত, যেখানে বলে হচ্ছে নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য ইবাদাতসমূহ শেষ দিন পর্যন্ত সর্বকালের সকল মুসলিমদের জন্য ফরয। সুতরাং এ আয়াতগুলোর দৃ"তে নবী (দ.) এর জীবদ্দশায় তাঁকে সম্মান করা উচিত; তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে আর সম্মান করা বা তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত নয়' ওয়াহাবিদের এ সকল ধারণা ভিত্তিহীন।

"উপর্যুক্ত আয়াতগুলো ইঙ্গিত করে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের প্রতি সম্মান দেখানোও জরুরি। সূরা আল বাকারার ১০৪ নং আয়াতের মূল বক্তব্য হলো : হে ঈমানদারগণ! তোমরা [নবী করীম (দ.) কে] রায়ীনা বলোনা; বরং উনযুরনা তথা "আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন" বলো। তোমরা আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করো। ঈমানদারগণ নবী করীম (দ.) কে রায়ীনা (আমাদের পাহারা দিন, আমাদের রক্ষা করুন) বলতো। ইহুদিদের ভাষায় রায়ীনা বলতে বুঝায় শপথ করা', কলঙ্কিত করা', আর ইহুদিরা এ অর্থে নবী করীম (দ.) এর জন্য শব্দটি ব্যবহার করতো। পাশাপাশি এটার মন্দ অর্থের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদের এ শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।

সূরা আল-আনফালের ৩৩নং আয়াতের মূলকথা হলো : আপনি (রসুল (দ.) তাদের সাথে থাকলে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না' এবং পৃথিবীর শেষ অবধি তাদের শাস্তি না দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ আয়াত ওয়াহাবিদের দাবি নবী করীম (দ.) নিঃশেষ হয়ে গিয়েছেন এবং মাটিতে মিশে গিয়েছেন'কে খণ্ডন করে। সূরা আল-বাকারার ৩৪নং আয়াতের সারকথা হলো : যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, "তোমরা আদম (আ.) কে সেজদা করো, শয়তান (ইবলিস) ব্যতীত সকলেই তাকে সেজদা করলো। এ আয়াত নির্দেশ দেয় যে আদম (আ.) এর প্রতি সম্মান দেখানো আবশ্যক। শয়তান আল্লাহ ব্যতীত অন্যকাউকে সম্মান দেখাতে অস্বীকার করেছিল ও নবী (আ.) এর নিন্দা করেছিল এবং এর মাধ্যমে সে এ আদেশ অমান্য করেছে। ওয়াহাবিরাও শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। ইউসুফ (আ.) এর পিতামাতা ও ভাইয়েরাও তাকে সেজদা করার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করেছিল। যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা শিরক কিংবা কুফরী হতো, তবে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের বর্ণনা দেয়ার সময় সাজদা' শব্দটি দিয়ে প্রশংসা করতেন না। আহলে সুন্নাহ'র মতানুসারে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা হারাম, এটি সম্মানের নিদর্শন বলে নয়; বরং এটা ইবাদতে সেজদার সদৃশ হওয়ার কারণে।

শয়তান সবসময় নজদের একজন বৃদ্ধের বেশে রসুল (দ.) এর কাছে আগমন করতো। যখন কাফেররা মক্কার দারুন নদওয়া নামক স্থানে সমবেত হয়েছিল এবং নবী করীমকে (দ.) শহীদ করার নিয়েছিল, তখন শয়তান নজদের বৃদ্ধের বেশ ধরে তাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল এবং কিভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো যায় তা কাফেরদের শিখিয়ে দিয়েছিল; নজদী বৃদ্ধের কথা মতো তা সম্পন্ন করতে তারা সম্মতও হয়েছিল। সেইদিন থেকেই শয়তানকে শায়খ আন-নজদী বলা হয়। হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আল-আরাবী তার "আল-মুসামারাত" এ লিখেছেন : যখন কুরাইশ কাফেররা কাবা শরীফের সংস্কার

করছিল, তখন প্রত্যেক গোত্রপতি-ই বলেছিল যে, সে হাজরে আল আসওয়াদ নামক মূল্যবান পাথরটি প্রতিস্থাপন করতে যাবে। পরবর্তীতে তারা এ ব্যাপারে একমত হলো যে, পরদিন সকালে যেই ব্যক্তি প্রথম কাবাগৃহে প্রবেশ করবে সেই সিদ্ধান্ত নিবে তাদের মধ্য হতে কে পাথরটি স্থাপন করতে যাবে। রসুল (দ.) সেই সত্তা, যিনি প্রথম প্রবেশ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং তারা বললো যে, তিনি যা বলবেন তারা তা মেনে নিবে , কারণ তিনি হলেন আল-আমিন তথা বিশ্বস্ত। তিনি (রসুল দ.) বললেন, একটি চাদর নিয়ে এসো এবং পাথরটি তার উপর রাখো। তোমরা সকলেই চাদরের প্রান্ত ধরো এবং যেখানে পাথরটি স্থাপন করা হবে ততটুকু উঠাও। "যখন পাথরটি উঠানো হল, তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে পাথরটি চাদর থেকে তুলে নিলেন এবং দেয়ালে যথাস্থানে পাথরটি স্থাপন করলেন। সেই মুহূর্তে শয়তান শায়খ আন নজদীর বেশে সেখানে উপস্থিত হল এবং একটি পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "এটির (হাজরে আসওয়াদ) ঠেস দেয়ার জন্য এর পাশে এটি রেখে দাও। "তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, তার ইঙ্গিতকৃত কদাকার পাথরটি ভবিষ্যতে পড়ে যাওয়া যাতে হাজরে আসওয়াদ তার স্থিরতা হারায় এবং ফলস্বরূপ লোকেরা রসুল (দ.) কে অশুভ মনে করে। এটা দেখে রসুল (দ.) "আউ'যু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম" পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ শয়তান পালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেহেতু শায়খ আন-নজদী হল শয়তান' এ লেখনির মাধ্যমে মুহিউদ্দিন ইবনে আল-আরাবী বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন, তাই লা-মাযহাবিরা এ মহান ওলীকে অপছন্দ করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা তাকে একজন কাফের বলে। এ অনুচ্ছেদ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, তাদের নেতাও একজন শয়তান। এ কারণে তারা রসুল (দ.) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পবিত্র স্থানসমূহ ধ্বংস করে'। তারা বলে যে এ স্থানগুলো মানুষদের মুশরিক বানিয়ে ফেলে। যদি পবিত্র স্থানসমূহে আল্লাহর কাছে দোয়া করা শিরক হতো, তবে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের হজ্জে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন না; রসুলুল্লাহ (দ.) তাওয়াফ এর সময় হাজরে আসওয়াদ এ চুমু খেতেন না; কেউই আরাফা ও মুযদালিফায় দোয়া করতো না; মিনায় পাথর নিক্ষেপ করা হতো না এবং মুসলিমরা সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে দৌঁড়াতো না। এ পবিত্র স্থানগুলোকে এতটা সম্মান দেয়া হতো না।

যখন আনসারদের সর্দার হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) তারা যে স্থানে সমবেত হয়েছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন, রসুল (দ.) বললে, তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। এ আদেশটি তাদের সকলের জন্য সা'দ (রা.) কে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এটা বলা ভুল, সা'দ (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তাকে তার বাহন থেকে নামাতে সাহায্যের উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছিল', কারণ আদেশটি ছিল তাদের সকলের জন্য। যদি তাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে এটা করা হত, তবে আদেশটি কেবলমাত্র একজন বা দুজনের জন্য হত এবং সা'দের জন্য' বলা হতো আর সেখানে তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে' বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে মক্কা গমনকালে প্রতিবারই রসুল (দ.) যে সব স্থানে অবস্থান করেছিলেন সেসব স্থানে থামতেন, সেখানে নামাজ আদায় করতেন এবং দোয়া করতেন। তিনি এসব স্থানের মাধ্যমে বরকতমণ্ডিত হতেন। তিনি রসুল (দ.) এর মিম্বরে হাত রাখতেন এবং তা তার মুখে মালিশ করতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে হুজরাত আস-সা'দা ও মিম্বরে চুমু খেতেন। লা-মাযহাবিরা একদিকে বলে যে তারা হাম্বলী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যদিকে তারা সে মাযহাবের ইমাম এর কাজকে শিরক বলে। তাই তাদের হাম্বলী হওয়ার দাবিটি মিথ্যা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর একটি জামা পানিতে ভিজিয়ে বরকত লাভের জন্য সেই পানি পান করতেন। খালিদ ইবনে যায়িদ আবু আইয়ুব আনসারী রা. রসুল (দ.) এর রওজা মোবারকে তার মুখ ঘষছিলেন, আর যখন কেউ একজন তাকে উঠাতে চায়ল, তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি পাথর কিংবা মাটির জন্য আসিনি; বরং আমি এসেছি রসুলুল্লাহ (দ.) এর দেখা পাওয়ার জন্য'। সাহাবায়ে কেরাম রসুল (দ.) এর জিনিসপত্রের মাধ্যমে বরকত হাসিল করতেন। তারা রসুল (দ.) এর ব্যবহৃত ওযুর পানি থেকে বরকত লাভ করতেন, তাঁর পবিত্র ঘাম থেকে, তাঁর জামা, লাঠি, তরবারি, জুতা, পানির পাত্র, আংটি, এক কথায় তাঁর ব্যবহৃত যেকোনো কিছু থেকে বরকত লাভ করতেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.) রসুল (দ.) এর দাড়ি মোবারক হতে একটি রেখে দিয়েছিলেন। যখন তার কাছে অসুস্থ লোকেরা আসত, তিনি সেই দাড়ি মোবারক পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি তাদের পান করতে দিতেন। ইমাম বুখারী (র.) এর মাযার হতে মেশক এর সুগন্ধি নিঃসৃত হতো এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে লোকেরা তার মাযারের মাটি নিয়ে যেতো। কোনো আলেম বা মুফতিই এসব অগ্রাহ্য করেননি। হাদিসবিশারদগণ ও ফকীহগণ এসব কাজের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৮৩] উসুল-উল-আরাবা গ্রন্থ হতে অনুবাদের এখানেই সমাপ্তি।

---

৮৩. আল উসূল আল আরাবা, ১ম অংশ।

[সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের সময়ে এমনকি এক সহস্রাব্দ বছর পরও অনেক আউলিয়া ও সালেহীন ছিলেন। লোকেরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাদের কাছ থেকে বরকত হাসিল করতেন এবং তাদের দোয়া নিতেন। মৃতব্যক্তিকে মাধ্যম (তাওয়াসসুল) বানানো কিংবা প্রাণহীন জিনিসের মাধ্যমে বরকত হাসিলের (তাবাররুক) কোনো প্রয়োজনই ছিল না। সেই সময়ে এ কাজগুলো অপ্রতুল ছিল মানে এটা নয় যে, সেগুলো নিষিদ্ধ ছিল। যদি এসব নিষিদ্ধ হতো, তবে সেগুলো প্রতিহত করার জন্যও লোক থাকতো। কোনো আলেমই সেসব করতে নিষেধ করেননি। যাহোক, শেষ যুগ শুরু হওয়ার সাথেই বিদ‘আত ও কুফরীর লক্ষণগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ছদ্মবেশে ইসলামের শত্রু ও বিজ্ঞানীদের[৮৪] দ্বারা যুবসমাজ প্রতারিত হচ্ছে এবং যেহেতু ধর্মবিমুখিতা বা ধর্মত্যাগ তাদের উদ্দেশ্যের সাথে খাপ খেয়েছে, স্বৈরশাসক, অত্যাচারী, ও তাদের দাসেরা এ কাজে যথেষ্ট সমর্থন দিয়েছে। আলেম ও ওলীদের সংখ্যা কমে গিয়েছে; প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কারো আগমন ঘটেনি, তাই আউলিয়া কেরামের মাযার ও তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জিনিসগুলোর মাধ্যমে বরকত হাসিল করা আবশ্যক হচ্ছে পরেছে। যাইহোক, যেমনটি সমস্ত বিষয় ও ইবাদতের ক্ষেত্রে হচ্ছে, এ রীতিগুলো বিভিন্ন হারাম কাজের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে গেছে। ইসলামের ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে[৮৫], এ রীতিগুলোকে নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে এ রীতিগুলোর মধ্যে মিশ্রিত বিদ‘আতের বৈধ প্রচলনগুলোকে সাটাই করা জরুরি। ইস্তাম্বুল, তুর্কির হাকীকত কিতাবেভী কর্তৃক প্রকাশিত অফারপব ড়ভ ওংষধস নামক বইটি দেখার অনুরোধ রইল। বইটির শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে হিজায এর মুসলিমদের উপর ওয়াহাবিদের নিশৃংসতা ও নিপীড়নের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মুসলিমরা কবরের উপর সমাধিফলক রাখে। তারা সেই ফলকে মৃত মুসলিমের নাম লিখে। যিয়ারতকারীরা ফলকে লিখিত নামের রূহের জন্য সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য দোয়া পাঠ করে থাকে। যদি কোনো মুসলিম ওলীর কবর যিয়ারত করে, তখন অন্য একটি দোয়াও করে যেখানে ওলীকে তার জন্য সুপারিশ করতে বলা হয় এবং তার জন্য দোয়া করতে বলা হয়।]

[৮৪]. যারা বিজ্ঞানীর বেশ ধরে তাদের বলা হয় শাম বিজ্ঞানী’ তথা নকল বিজ্ঞানী, যেখানে যারা ধার্মিক এর বেশ ধরে তাদের বলা হয় যিনদিক্ব’।

[৮৫]. এই বিষয়ে আলেমদের লেখনি আহমদ বিন যায়নী দাহলান এর আদ-দুরুর আছ-ছানিয়্যা ফি-র-রদ্দি আ-লাল ওয়াহাবিয়্যা, মিশর, ১৩১৯ ও ১৩৪৭ গ্রন্থে উল্লেখ আছে; ফটোগ্রাফিক পুনঃমুদ্রণ, ইস্তাম্বুল, ১৩৯৫ (১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)। যারা এই বইটি পড়বে, তাদের এই বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

সমাপনী মন্তব্য

আল্লাহ তা'য়ালার সকল গুণাবলী তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত হয়। ক্ষুদ্র নিদর্শনেও রয়েছে তাঁর মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ। উদাহারণস্বরূপ, তাঁর দয়া ও ক্ষমাশীলতার গুণ যেভাবে সৃষ্টিসমূহে প্রকাশ পায়; একইভাবে তাঁর ক্রোধ, অসন্তুষ্টি এবং বিরক্তিও প্রকাশিত হয়। তিঁনি প্রতিটি জিনিষে উপকারী ও ক্ষতিকারক উভয় দিকই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ধারণা করে যে, সকল আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিকর বস্তু সবসময় উপকারী। আর এরকম মনে করাটা তাকে ভুল পথে পরিচালিত করে।আল্লাহ তা'য়ালা যিনি অত্যধিক দয়ালু , তিঁনি অসংখ্য নবীদের প্রেরণ করেছেন। তাঁরা প্রতিটি বিষয়ে উপকারী ও ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন। তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন ঐ সমস্ত কর্মগুলো করতে যেগুলো মানুষের জন্য উপকারী। আর যেগুলো ক্ষতিকারক সেগুলো করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা আবশ্যক নির্দেশনাগুলোকে ফরজ হিসেবে এবং নিষেধাজ্ঞাগুলোকে হারাম হিসেবে অবহিত করেছেন। এ নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ শরীয়তের পরিভাষা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। দুনিয়া পরিহার করা বলতে হারাম পরিহারর (প্রতিজ্ঞা) করাকে বুঝায়। দুনিয়া শব্দের আরেকটি অর্থ হলো মৃত্যু-পূর্ব জীবন। পার্থিব সকল আনন্দ ও স্বাদ কিন্তু হারাম (নিষেধ) নয়। বরং সেগুলোই হারাম যেগুলোর ব্যবহারে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাতে পারে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন বিষয় উপভোগ করে এবং আনন্দ নিয়ে থাকে। আর এটা হলো অন্তর ও নফসের একটি অবস্থা।

মানুষের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তরের আজ্ঞাবহ। এ অন্তর, যাকে আমরা কলব বলি; তা কখনো দৃশ্যমান নয়। এটা হলো মানবদেহের মাংসপিণ্ডে রূপায়িত একটি শক্তি (Power) বিশেষ। যাকে আমরা হৃদয় (Heart)ও বলে থাকি।

নফস হারাম কাজ উপভোগ করে। শয়তান এবং নফস একই পথেরই। আবার শয়তন ভিন্ন একটি দল, যারা ক্ষতিসাধক মানুষদের ভ্রান্ত কথা ও লেখাকে শুধু অন্তর্ভুক্ত করে না বরং আকাশবাহী রেডিও ও টেলিভিশনকেও খারাপ পথে পরিচালিত করে। যা মানুষের মাঝে এগুলোকে চিত্তবিনোদন হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা সৃষ্টি করিয়ে দিচ্ছে এবং অন্তর (ঐবধৎঃ) কে হারাম কাজ করতে প্রলুব্ধ করছে।

একজন মানুষ যার অন্তরে ঈমান আছে। যিনি বিশ্বাস করেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন একজন নবী ও রসুল ; তাহলে তাকে মুসলিম বলা হবে। একজন মুসলিমকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়ত অনুযায়ী তার সকল কর্ম সম্পাদন করতে হবে। আর তাকে এ শরীয়ত শিখতে হবে সেসমস্ত কিতাব হতে যেগুলো সত্যিকার ইসলামি পণ্ডিতগণ লিখেছেন। যাদেরকে আমরা আহলে সুন্নাত উলামা বলে থাকি। তার উচিত নয়, এমন বই পড়া যেগুলো লা-মাযহাবীরা লিখেছে। সে নিজেকে শরীয়ত অনুযায়ী চলার জন্য উপযোগী করে তুলবে। সে দুনিয়ার হারাম কাজ সমূহকে ঘৃণা করবে। যার অন্তর হারাম কাজের ইছা হতে মুক্ত, আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা তার মাঝে প্রবাহিত হবে। এর উদাহরণ ঠিক এরকম যে, যখন কোনো বোতল পানিহীন অবস্থায় থাকে তখন এটি বায়ু ধারণ করে, যা পানির স্থান দখল করে নেয়। এ অজানা বোধশক্তি এভাবেই আমাদের অন্তরকে উন্নত করে। এটা পুরো বিশ্বকে হৃদয়ঙ্গম করা শুরু করে, এমনকি এ শক্তি বিরাজমান থাকে কবরের জীবনেও। এ বিশুদ্ধ কলব তথা অন্তর আওয়াজ শুনতে পারে যেখানেই সেটা থাকুক। যেখান হতেই সাড়া আসুক এটি অবশ্যই শুনতে পাবে। তার সকল ইবাদত ও প্রার্থনা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে কবুল করা হবে। সে লাভ করবে একটি শান্তিময় ও সুখী জীবন।

আল-ফিকহু আলাল মাযাহিব আরবাআ কিতাবের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় এরকম বর্ণনা রয়েছে যে, যে মুসলিম ব্যক্তির কোনো উজর নেই, তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে। কোনো নামাজ তার নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে আদায় করা কখনো বৈধ নয়। ইসলাম একটি সহজ ও সুবিধাজনক ধর্ম। অপারগ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে আদায় করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। কিছু অবস্থা ও শর্ত সাপেক্ষে এ সুযোগটির বৈধতা রয়েছে। এ সকল শর্তপূরণ ব্যতীত কেউ যদি নির্ধারিত সময় ছাড়া সালাত আদায় করে তাহলে তা অবশ্যই গুনাহ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর এ শর্তসমূহ নির্ভর করছে আপনার মাযহাবের ইমামগণের মতামতের উপর।

মালেকী মাযহাবের মতে, নামাজের মধ্যে জামা করা জায়েজ। (অর্থাৎ দুটি আলাদা নামাজকে কোনো একটির নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় কর.)। শর্তগুলো হলোঃ দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ তথা সফরের সময়। (এ প্রসঙ্গে এন্ডলেস বিলেস-৫ এর পনেরতম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে), অসুস্থতার সময় এবং বৃষ্টিকালীন সময়।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, সফর ও বৃষ্টিকালীন সময়ে নামাজ জামা করা জায়েজ। তবে শর্তসমূহ পরিপূর্ণ পাওয়া যেতে হবে।

হানাফি মাযহাবের মতে, শুধুমাত্র হাজীদের জন্য নামাজ জাম করার অনুমিত আছে; যখন তারা আরাফাহ্ ও মুজদালিফার ময়দানে অবস্থান করে। তারা এ দুই স্থানে একই সময়ে দুই ওয়াক্তের নামাজ একসাথে আদায় করবে।

হাম্বালী মাযহাবের মত হলো, যে সকল লোকদের জন্য নামাজ জামা করার অনুমতি আছে তারা হলেনড় ১.এমন ব্যক্তি যিনি সফরে আছেন। ২. অসুস্থ ব্যক্তি। ৩.সন্তানকে দুগ্ধদানকারিনী মহিলা। ৪. রজঃস্রাব চলাকালীন সময়ে নারীরা।.৫ যেব্যক্তি এমন ওজরে ভুগছেন যার কারণে তিনি অজু করতে পারছেন না বা কোনো কারণে অজু বা তায়াম্মুম করতে অপারগ ব্যক্তি। ৬.অন্ধ ব্যক্তি। ৭. যে সমস্ত লোকেরা নামাজের সময়সূচী অনুসরণ করতে অপারগ। ৮.কারো অধীনে কর্মজীবী ব্যক্তি। ৯. যে লোক তার জীবন, সম্পদ বা সতীত্ব হারানোর ভয়ে থাকেন বা কোনো রকমের ক্ষতির আশঙ্কা করেন।

দুটি নামাজকে জামা করা বলতে বুঝায় পরবর্তী নামাজকে পূর্ববর্তী নামাজের ওয়াক্তে তাকদীম করে একসাথে আদায় করা অথবা পূর্ববর্তী নামাজকে পরবর্তী নামাজের ওয়াক্তে তাখীর করে একসাথে সালাত আদায় করা।

মসজিদে নববী

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণে চারটি ভিন্ন ধাপের বর্ণনা :
১. বাবুস সালাম
২. বাবুল জিব্রীল
৩. বাবুন নিসা
৪. বাবুর রাহমাহ্
৫. বাবুত তাওয়াসসুল
৬. শাবাকাতুস সাআদা
৭. হুজরাতুস সাআদা
৮. মুয়াজাহাতুশ শরীফা।
৯. মিহরাবুন নবী
১০. মিহরাবুল উসমানী
১১. বালুকাবৃত অংশ

একজন সত্যিকার মুসলিম কেমন হওয়া উচিৎ

প্রথম উপদেশ হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম তাদের লিখিত কিতাবে আমাদেরকে যে সকল শিক্ষা প্রদান করেছেন, তদানুযায়ী স্বীয় আকিদা পরিশুদ্ধ করা। এটাই একমাত্র পথ যা আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা সেই সকল চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামদের উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন যারা এরকম মহৎ কাজগুলো আমাদের জন্য করে গিয়েছেন। আর উত্তম পুরস্কার দান করুন তাদের থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত সে সমস্ত উলাময়ে কেরামদেরও যারা হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পণ্ডিত। আকীদা (ঈমান) পরিশুদ্ধ করার পর একজন মুসলিমের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলোড় ফিকাহের জ্ঞানানুসারে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত বন্দেগী করা। তাকে শরীয়তের নির্দেশনাবলী যথাযথ পালন ও নিষেধাজ্ঞা হতে যথাসাধ্য দূরে থাকতে হবে। কোনো ধরণের অলসতা ও অবহেলা ছাড়া তাকে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময়ে আদায় করতে হবে এবং নামজের শর্তসমূহ ও তাদীলে আরকানের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। যার নিকট নেসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। ইমাম আজম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মহিলারা অলংকার হিসেবে যে সকল স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা ব্যবহার করে থাকে, সেগুলোরও যাকাত আদায় করতে হবে।

অপ্রয়োজনীয় মুবাহ কাজে সময় নষ্ট করা কারো জন্য উচিত নয়। আর হারাম কাজে সময় অপচয় করা তো কারো জন্যই কাম্য নয়। গানবাজনা, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র বা মিউজিকে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখা আমাদের জন্য কখনো উচিত নয়। এগুলো নফসকে যে আনন্দ দেয় তা হতে আমাদের আত্মাকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে। কেননা এসব হলো এমন বিষ যেগুলো মধু ও চিনি মিশ্রিত।

কারো গীবত করা উচিত নয়। গীবত করা হারাম। (গীবত বলা হয় কোনো মুসলিম বা জিম্মীর গোপন বিষয় তার অগোচরে কারো নিকট প্রকাশ কর.)। তবে হারবী তথা অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের দোষ মুসলিমদের নিকট প্রকাশ করাতে কোনো অসুবিধে নেই। সে সমস্ত লোকদেরও দোষ বর্ণনা করা যাবে, যারা জনসম্মুখে অপরাধ করে বেড়ায় এবং ক্রয়-বিক্রয়ে মুসলামনদের ধোঁকা দেয়; যাদের কারণে মুসলিম জনসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ সকল ধোঁকাবাজ-প্রতারক ব্যক্তিদেরও মুখোশ উন্মোচন করা একান্ত প্রয়োজন যারা বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে। এরকম সতর্কতাগুলো গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[রাদ্দুল মুখতর : ৫-২৬৩]

মুসলমানদের মাঝে পরচর্চা করাও কারো জন্য উচিত নয়। বলা হয়ে থাকে এ দুপ্রকার অপরাধ মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী। মিথ্যা বলা ও অপবাদ দেয়াও হারাম এবং অবশ্যই এগুলো এড়িয়ে যেতে হবে। এ দুধরণের গুনাহ সকল ধর্মেই হারাম। এর শাস্তিও কঠোর। কোনো মুসলমানের দোষক্রুটি আড়াল করা বা তাদের গোপনীয় কোনো গুনাহ প্রকাশ না করা এবং তাদের ভুলক্রুটি ক্ষমা করে দেয়ার মাঝে অসংখ্য সাওয়াব ও ফজীলত রয়েছে।

প্রত্যেকের উচিত নিম্নপদস্ ব্যক্তি ও অধীনস্ লোক (যেমন স্ত্রী, পুত্র, শিষ্য, সেনাবাহিনী/ প্রজা) এবং গরীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা। তাদের কোনো ভুলের জন্য তাদের উপর নির্যাতন করা কারো জন্য উচিত নয়। এরকম গরীব লোকদেরকে তাদের কোনো ক্ষীণ ভুলের জন্য কষ্ট দেয়া, আহত করা বা জোর দিয়ে কোনো কটু কথা বলা একেবারেই উচিত নয়। কারো সম্পদ, জীবন, ইজ্জত বা সতীত্ব হরণ করা কোনো মুসলমানের জন্য শোভা পায় না।

অন্য লোক ও সরকারের হক অবশ্য আদায় করতে হবে। ঘুষ নেয়া ও দেয়া উভয়টিই হারাম। তবে কোনো নির্দয় মানুষের নির্যাতনের কবল হতে বাঁচতে বা কারো বিরক্তকর পরিস্থিতি হতে নিজেকে হেফাজত করতে ভারমুক্তমূলক কোনো কিছু প্রদান করা ঘুষ নয়। এসমস্ত কারণ ব্যতীত কারো হতে ঘুষের আবেদন আসলে তা গ্রহণ করা অবশ্য হারাম সাব্যস্ত হবে।

প্রত্যেকের উচিত নিজের দোষের দিকে দেখা। প্রতিটি মুহূর্তে তার চিন্তা করা উচিত যে, সে আল্লাহর কী কী নাফরমানি করছে। তার উচিত এ বিষয়টি সবসময় মাথায় রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার নাফরমানির জন্য সাথে সাথে শাস্তি প্রদান করছেন না এবং তার রিযিকও বন্ধ করে দিছেন না।

পিতামাতার আদেশ বা সরকারের এমন নির্দেশনা যা শরীয়তসম্মত তা অবশ্যই তাকে পালন করতে হবে। কিন্তু যে সকল বিষয় শরীয়তসিদ্ধ নয় তা প্রতিরোধ করাও উচিত নয় যদি ফেতনা ছড়ার আশংকা থাকে। [মাকতুবাতে মাসুমিয়া কিতাবের ২য় খণ্ডের ১২৩তম পত্রটি দেখুন]

আকীদা শুদ্ধ করা এবং ফিকাহ মুতাবেক হুকুম আহকাম পালন করার পর প্রত্যেকের উচিত হলো প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করা। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আল্লাহর কথা স্মরণ ও যিকির করা এ হিসেবে যে, তিনি ইসলামকে একটি সত্য ও মহান ধর্ম হিসেবে মনোনীত করছেন। যে সমস্ত বিষয়াবলী মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণ হতে দূরে রাখে সেগুলোর প্রতি অবশ্যই শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। তুমি যত বেশী শরীয়তের পাবন্দী হবে আল্লাহকে স্মরণ করা তত বেশী স্বাদময় অনুভূত হবে। অলসতা করে যদি কেউ শরীয়তের অনুসরণ কমিয়ে ফেলে তাহলে সেই স্বাদ ও আনন্দও কমতে থাকবে; সবিশেষে তা শূন্যতে পরিণত হবে।

মুসলিম নর-নারী সকলের জন্য এটা হারাম যে, তাদের সতর অনাবৃত রেখে বাহিরে বের হওয়া বা এমন বহির্ভূত কাজকর্মগুলো করা যেখানে সতর আবৃত করা যায় না; যেমন–বল খেলা , সাতাঁর কাঁা ইত্যাদি। (সতর বলা হয়, শরীরের এমন অংশ যা অন্য কারো সম্মুখে প্রকাশ করা ইসলামে নিষিদ্ধ)। এমন জায়গাতেও অংশগ্রহণ করা হারাম যেখানে সতর প্রদর্শন করা হয়। [এথিক্স অব ইসলাম]

যখন কেউ হারাম কাজ সংঘটিত করে তখন সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও যথাসময়ে আদায় করতে আলস্য করে। অনেক সময় নামাজও আদায় করতে পারে না। এটা শুধু একজন মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করায় না বরং ধীরে ধীরে তাকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়।

যে কোনো প্রকারের গানবাজনার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হারাম। এমনকি ধর্মীয় সংগীত, কুরআনুল করীম তেলাওয়াত, মৌলুদ শরীফ (রসুলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসামূলক উক্তি) , আজান ইত্যাদির ক্ষেত্রেও নিষেধ (বি. দ্র : কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম ইসলামি সংগীত যেমন হামদ-নাতের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার বৈধ বলেছেন)। মওয়াহাবীরা কিছু অমূলক কারণ দেখিয়ে মৌলুদ শরীফকে নিষেধ করার অপচেষ্টা চালায়। যেমন তারা বলেড় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন, তিনি তোমাদের শুনতে পাবে না। আল্লাহর ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসা করা শিরিক্। ওয়াহাবীদের এরকম বিশ্বাস করাটা কুফুরী।

লাউড স্পীকার ব্যবহার করা টেলিফোন ব্যবহারের মত। যে বিষয়গুলো বলা হারাম সেগুলো লাউড স্পীকারের মত যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ করারও অনুমতি নেই। শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে লাউড স্পীকার ব্যবহারের অনুমতি আছে। যেমন বিজ্ঞান শিক্ষা, শিল্পকলা, অর্থনীতি, ধর্মীয় জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিক শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। দূর্নীতিমূলক প্রচারণা; যা নৈতিকতার অবক্ষয় সাধন করে বা ধর্মীয় ভাবমূর্তি নষ্ট করে, এমন কিছুর জন্য লাউড স্পীকার ব্যবহার করা বৈধ নয়। আজান যদ্বারা মানুষকে নামাজের জন্য আহবান করা হয় এক্ষেত্রেও লাউড স্পীকার ব্যবহার করা উচিত নয়। মিনারায় উঠে আজান দেয়ার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত লাউড স্পীকার হতে যে আওয়াজ বের হয় সেটা মুয়াজ্জিনের আওয়াজ নয়। বরং এটা একটা যন্ত্রের নিজস্ব ধ্বনি। যদিওবা তা মানব কণ্ঠের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। যখন আমরা এটির আওয়াজ শুনবো তখন আজান হচ্ছে এমনটা না বলে আমাদের বলা উচিত এটা নামাজের সময়। কেননা লাউড স্পীকার দ্বারা যে ধ্বনিটা সৃষ্টি করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে আজানের ধ্বনি নয়। এটা আজানের একটি নকল প্রতিরূপ।

হাদীসে পাকে বর্ণিত হচ্ছে যে, শেষ জামানায় কুরআনুল করীম মিজমার (যন্ত্র) এর মাধ্যমে পাঠ করা হবে, এমন একটি সময় আসবে যখন কুরআনুল করীম মিজমার দ্বারা পাঠ করা হবে, এটা তেলাওয়াত করা হবে আল্লাহকে খুশী করার জন্য নয় বরং প্রমোদের জন্য, অনেক লোক কুরআনুল করীম পাঠ করবে কিন্তু কুরআনুল করীম তাদের প্রতি অভিসম্পাত দিবে, এমন একটি সময় আসবে যখন অসংখ্য অসৎ লোক মুয়াজ্জিন হচ্ছে যাবে, এমন একটি জামানা আসবে যখন কুরআনুল করীম মিজমারের সহিত পাঠ করা হবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর অভিসম্পাতের ঘোষণা দিয়েছেন।
মিজমার হলো এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; যেমন–বাঁশি। লাউড স্পীকারও একটি মিজমার। মুয়াজ্জিনদের উচিত এ হাদিসগুলো শুনে সতর্ক হওয়া এবং লাউড স্পীকার দ্বারা আজান দেয়া পরিত্যাগ করা। ধর্মীয় বিষয়াবলী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিছু মানুষ এটির ব্যবহারকে দোষের কিছু মনে করে না, তারা বলে থাকে এটি একটি উপকারী যন্ত্র কেননা তা দ্বারা অনেক দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছানো যায়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাবধান করে ঘোষণা দিয়েছেনড় তোমরা সেরূপেই ইবাদত বন্দেগী করো যেরূপ আমাকে এবং আমারা সাহাবাদের করতে দেখেছো। যে সমস্ত লোকেরা ইবাদতের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে তারা হলো আহলে বিদ'আত। প্রত্যেক বিদ'আতি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের কারো ইবাদত গৃহীত হবে না।
ধর্মীয় বিষয়াবলীতে পরিবর্তন সাধন করে উপকার করার দাবি করাটা কখনো ভালো কিছু হতে পারে না। এরকম দাবি করাটা মূলত ইসলামের শত্রুদের সাজানো একটা মিথ্যাচার। ইসলামি পণ্ডিতরাই বিচার করতে পারেন কোন ধরণের পরিবর্তনটা উপকারী। তাদেরকে বলা হয় মুজতাহিদ। প্রকৃতপক্ষে মুজতাহিদরা কখনো পরিবর্তন সাধণ করেন না। তারা জানেন কী ধরণের সংস্কার বা পরিবর্তন বিদ'আত হতে পারে। তারা সর্বসম্মত হচ্ছেন যে, লাউড স্পীকার দ্বারা যে আজান দেয়া হয় তা একটি বিদ'আত।
যে পথ আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসার দিকে পরিচালিত করে তা মানব আত্মার মধ্য দিয়েই হয়। হৃদয় হলো একটি স্বচ্ছ আয়নার মত। ইবাদত বন্দেগি হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও জ্যোতির সাথে সম্পৃক্ত। গুনাহ অন্তরকে অন্ধকারছন্ন করে ফেলে। যার ফলে এটি সেই অদৃশ্য ভালোবাসার রশ্মি হতে অধিক ফয়েজ (আধ্যাত্মিক দীক্ষা) ও নূর (জ্যোতি) হাসিল করতে পারে না। একজন সালিহ ধার্মিক ব্যক্তি এটির অনুপস্থিতি আন্দাজ করতে পারেন এবং এ সম্পর্কে দুঃখ উপলব্ধি করতে পারেন। তারা গুনাহের প্রতি অনাসক্ত হোন এবং অধিক অধিক ইবাদত করতে আগ্রহী হতে থাকেন। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে আরো অন্যান্য নফল নামাজও তারা ভালো মতো আদায় করেন। গুনাহ-কর্ম মানব-নফসের কাছে খুব মধুর ও উপকারী মনে হয়। সকল প্রকারের বিদ'আতে সায়্যিআ এবং অপরাধ নফসের নিকট খুব উপভোগ্য মনে হয়। অথচ এগুলো হলো মহান আল্লাহর শত্রু। এগুলো পাপের কেল্লাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, লাউড স্পীকার দ্বারা আজান দেয়া তাদের মধ্যে একটি।
শিশুকাল হলো জ্ঞান অর্জনের বয়স। যদি এ সময়টার পুষ্পোদগম ভেঙে যায় তাহলে মুসলিম সন্তানেরা অবহেলিত হতে থাকবে যার ফলস্রোতে তারা একটি অধার্মিক প্রজন্মের দিকে এগিয়ে যাবে। এরকম নীরব অসতর্কতায় চরম সর্বনাশার প্রেক্ষিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষরা মহা অপরাধের ভাগীদার হবেন। যদি কোনো ব্যক্তি হালাল ও হারাম বিষয়গুলো সম্পর্ক জানলো না অথবা কেউ জানা সত্ত্বেও এগুলোকে অবজ্ঞা করলো সে কাফেরে পরিণত হবে। সে ঐসকল কাফেরদের থেকে ভিন্ন কেউ নয়, যারা খ্রিষ্টান মথবা মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে।একজন মানুষের দুষ্টবুদ্ধিই হলো তার নিজস্ব শত্রু। এটা সবসময় এমন কিছু করতে চায়, যা তার জন্য ক্ষতিকারক। নফসের বাসনাকে শাহওয়াত বা কুপ্রবৃত্তি বলা হয়। এরূপ নফসের পার্থিব কর্মগুলো তাকে আনন্দ দেয়। কিন্তু প্রয়োজন সাপেক্ষ কোনোকিছু করা অপরাধ নয়। তারপরেও অতিরিক্ত করে ফেলাটা অবশ্য ক্ষতিকর ও পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইসলামের শত্রুরা মুসলমান সন্তানদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা হতে বিভ্রান্ত করতে এবং বল খেলাকে একটা খেলার নাম বা শারীরিক ব্যায়াম হিসেবে পরিচয় দিয়ে এটির প্রতি তাদেরকে প্রলোভিত করছে। সতর আবৃত করা ইসলামের বিধান। অথচ সতর প্রদর্শন এবং অন্যের নিকট তা উপভোগ্য করার মত হারাম কাজ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও বল খেলার প্রতি মুসলমান সন্তানদের দিন দিন আসক্তি তৈরি হচ্ছে।
মুসলমান মা-বাবার এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া উচিৎ যে, তাদের যুবক-যুবতী সন্তানদের যথাসম্ভব একটি উপযুক্ত বিবাহের ব্যবস্থা করা। তাদের উচিত সন্তানদেরকে অবৈধ যৌনচার বা বল খেলার মত হারাম কাজগুলো হতে হেফাজত করা; যেখানে তাদেরকে সতর প্রদর্শন করতে হয়। পিতামাতার উচিৎ তাদের সন্তানদেরকে একজন সত্যিকার মুসলিম শিক্ষক (মুর্শিদ) এর নিকট পাঠানো, যাতে করে তারা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে

হাকীকত কিতাবেভীর প্রতি এক ভাইয়ের আবেগভরা চিঠি

বরাবর,
হাকীকত কিতাবেভী
প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।
সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।
আমি এ চিঠিটি লিখেছি আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে এবং এ আধুনিক ও অন্ধকার যুগ হতে মুসলিম ও ইসলামকে রক্ষা করে সত্য সরল পথে পরিচালিত করার যে পদক্ষেপ আপনারা গ্রহণ করেছেন ; তার প্রশংসা করতে।
আমি আপনার মূল্যবান ও গুরুত্বপূরর্ণ বই এন্ডলেস বিলেস্-৪, বিলিফ এন্ড ইসলাম এবং দ্যা সুন্নি পাথ্ ইতিমধ্যে রিসিভ করেছি। কাদ্বা ও কাদার এবং মিউজিক সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে একটি চিঠি আপনাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম, এটির ছয়দিন পরই আমার নিকট বইগুলো পৌঁছেছে। আমার জানা নেই, আপনাদেরকে কীভাবে ধন্যবাদ দিব। কোনো শব্দ বা বাক্য সংবলিত চিঠি আপনাদের প্রতি আমার অনুভূতি বহন করতে সক্ষম নয়। আমি চাই না যে, শব্দ বা চিঠির মধ্য দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশটা সীমাবদ্ধ করে ফেলি আর আমি আশঙ্কা করি যে, হয়ত আপনারা এর দ্বারা আমার ক্ষীণ এবং দুর্বল মানসিকতা ধরে নিবেন।
প্রথমত আমি ধন্যবাদ প্রকাশ করছি এন্ডলেস বিলেস্-৩ সহ আরো অন্যান্য বইয়ের। সাথে সাথে এটির এবং হাকীকত কিতাবেভী হতে প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহের মূল্য গ্রহণের আবেদন করছি। আপনারা সত্যিই মহান ব্যক্তি! আপনারা আমাকে বইয়ের মূল্য পরিশোধ করতে বলেননি, তা সত্ত্বেও আরো অনেক বই কোনো বিনিময় ছাড়া-ই আমার নিকট পাঠিয়েছেন। আমি জানি না আপনাদের কী বলে ধন্যবাদ জানাবো। আপনারা আমার অন্তর প্রশান্ত করেছেন, নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের হতে আমাকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের উপর রাজী হোন, দয়া করুন এবং অসংখ্য অগণিত প্রতিদান দ্বারা পুরস্কৃত করুন। আমীন।
আমি মনোযোগ আকর্ষণ করছি এন্ডলেস বিলেস্-৪ সহ আরো কিছু বইয়ের উপর। আমি অনুমান করতে পারছি যে, আপনারা ইসলামকে তার সত্যিকার শুদ্ধতার সাথেই উপস্থাপন করছেন। আমি অত্যন্ত খুশী। আপনাদের ভালো গ্রন্থনা সম্পর্কে বলতে চাই যে, এটি আমার অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছে। এ বইটি বাস্তব বিশ্বাস ও একজন মুসলিমের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্য অসাধারণ একটি বই। বইটি আমার বন্ধুতে পরিণত হচ্ছে যখন আমি বাইরে বের হয়। যখন একা থাকি তখনকার সাথী, যখন শিখি তখনকার শিক্ষক এবং যখন প্রার্থনা করি তখনকার পথপ্রদর্শক। সব বই আসলেই সেরা। এ বইগুলোর কারণে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিড় একজন মানুষ নিজেকে বিলাসিতা ও ধন-দৌলতে ভাসিয়ে রাখতে পারে না। একটি সুখী জীবন হলোড় কঠোর পরিশ্রম করা এবং সকল বয়সের মানুষের নিকট ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেয়া।
যাইহোক, আমি অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাছি যে, আমার পিতা ভালোমতো ইসলাম অনুশীলন করেন না। অনেক বছর পূর্ব থেকেই এটা আমার ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার মাঝে অন্তরায় হচ্ছে দাড়িঁয়েছিল। দীর্ঘ বছর পর্যন্ত আমি নির্যাতনের শিকার হয়েছি এবং আমার পরিবারে কোনো শান্তি ছিল না। আমি সর্বদা চিন্তিত অবস্থায় থাকতাম এবং আমার সর্বোত্তম সক্ষমতা দিয়ে এ পরিস্থিতি হতে বের হওয়ার পথ উদ্ভাবনের পরিকল্পনা করতাম। এমন সময়ে আমার বয়সের একজন যুবক আমার জীবনে আসে। আমরা খুব অন্তরঙ্গ ছিলাম। প্রায় সময় আমাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরস্পরের সাথে আলোচনা করতাম। আমার অসুবিধার কথা শুনে সে আমাকে আপনাদের প্রকাশনা বরাবর একটি চিঠি

লেখার পরামর্শ দেয়। আমি এ প্রত্যাশায় নিদারুণভাবে বসে থাকতাম যে, কীসে আমাকে একজন মুসলিম হিসেবে তৈরি করতে পারে। আমি খুব সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতাম যে, কীভাবে একজন সত্যিকার মুসলিম হওয়া যায় এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে পবিত্র কুরআনুল করীম ও তার হুকুম-আহকাম গ্রহণ করা যায় এবং আন্তরিক ও পুরোপুরিভাবে সেগুলোর অনুশীলন করা যায়।

পৃথিবীর এ অংশে, মানুষগুলো খুব খারাপ। এখানে অনেক মতবিরোধী ফেরকা আছে যারা ধর্মকে একটা খেলা বানিয়ে ফেলেছে, ধর্মে বাণিজ্য করে এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির কামনা বাসনানুযায়ী ধর্মকে একটা ব্যবসায় রূপান্তরিত করেছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম নেতা হিসেবে দাবী করে অথচ তারা পথভ্রষ্ট এবং ইসলাম হতে অনেক দূরে। তাদের অনেকে ধর্মকে এমন ব্যবসায় পরিণত করেছে যে, তারা এটার পুঁজি করে মিলিয়ন মিলিয়ন নাইরা (নাইজেরিয়ান মুদ্রা) উসুল করে নেয়। আসলে কেউ-ই সচেতন হতে পারেনি। এ ভণ্ড ধর্মীয় নেতারা সুন্দর সুন্দর শব্দ দিয়ে বিশ্বাসকে সংকোচিত করতো, কথাগুলো সুন্দর অলংকারপূর্ণ শব্দ দ্বারা সাজাতো মাত্র যাতে মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়।

নিজেকে আপনাদের প্রকাশনার সাথে সংযুক্ত করার পর, এখন আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, হযরত হিলমী ইশিক ব্যতীত আমার কাউকে বা কোনোকিছু এ পৃথিবীতে প্রয়োজন নেই। আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, যদি আমি সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অন্বেষণ করতে অপারগ হয় তাহলে পরকালে আমাকে অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে। আমি যদি ইসলামের শিক্ষা, অনুশীলন ও খেদমত না করি তাহলে বিচারের দিন আল্লাহ তা'য়ালাকে কী জবাব দেব?

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা, আমি শুধু দ্বীনকে শিখার জন্যই আমার মানসিকতাকে তৈরি ও প্রস্তুত করেছি। আমি চাই না তাদের সর্বনাশাগুলো অসহায়ভাবে দেখে তেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে। অতএব আমি অনেক খুশি হবো যদি আপনারা আমার তুর্কীতে আসার বিষয়টি অনুগ্রহপূর্বক বিবেচনা করেন। আমি আপনাদের সাথে থাকতে পছন্দ করছি যাতে আপনাদের সকল কর্মকাণ্ডের পরিমণ্ডলে সাথী হচ্ছে থাকতে পারি এবং ইসলামের জন্য সংগ্রাম করতে পারি; যেভাবে আপনারা করে যাচ্ছেন। আমি আপনাদের তত্ত্বাবধান ও অনুগ্রহে অবস্থান করে বিশুদ্ধ দ্বীন সম্পর্কে জানতে চাই এবং হানাফি মাযহাব অনুযায়ী নিজেকে তৈরী করতে চাই।

যদি আমার আবেদন গ্রহণ করা হয়, তাহলে আমি আমার বিস্তারিত তথ্য আপনাদেরকে দিতে পারি যাতে আমার ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থাদি তৈরি করতে সহজ হয়। এদিকে আমার তেমন কোনো বন্দোবস্ত নেই। আমি শুধু কিছু বছর আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই। আমার পরিবহন খরচ অর্জন করার উদ্দেশ্যে।

আমি আবারও আপনাদের অবহিত করছি যে, আমার একটি পটোগ্রাফের কপি ভিতরে রাখা আছে এবং আমার শেষ পত্রটিতে কাদা ও কাদার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা আছে। এন্ডলেস বিলেস-৪ মিউজিক সম্পর্কে আমার দ্বিধা দূর করে আমাকে যথাযথ উত্তর প্রদান করেছে।

আমি চাই যে , আপনারা আমাকে আপনাদের আরো মূল্যবান বই নিয়মিত পাঠাবেন। খারাপ মানুষদের কাজকর্ম এবং ইসলামের শত্রুদের বইয়ের বিরোধিতা ও তা হতে নিজেকে রক্ষা করতে আপনার যে খেদমত চালিয়ে যাচ্ছেন; তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আপনারা যেখানেই থাকুন আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন! আমীন। ওয়াস সালাম।

ইতি

আপনার একজন ইসলামি ভাই।

আলাবী

সি/ও মুহাম্মদ শাইখ

পোস্ট অফিস বক্স-১০৭১

ওগবোমুসো, উয়োও প্রদেশ।

নাইজেরিয়া।